প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী

সুধাংশু পাত্র

মাতৃদেবী শ্রীচরণেষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানের গল্প রূপকথার গল্পের মতোই উপাদেয়। বিজ্ঞানের গল্প তারা শোনে, শোনে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকদের কথা। বেশীর ভাগ শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করেছেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাই। তাই তাদের মনে এক স্বাভাবিক প্রশ্ন ভারতের মত এত বড় এক উপমহাদেশ বিজ্ঞান শাস্ত্রকে কতটুকু সমৃদ্ধ করতে পেরেছে? 'প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান' বইটি আশাকরি তাদের সে কৌতূহল মেটাতে কিছুটা সমর্থ হবে।

বইটি যাতে কেবলমাত্র তত্ত্বমূলক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনীর উপস্থাপনা করতে হয়েছে। কাহিনীগুলির কোনটি পৌরাণিক, কোনটি কিংবদন্তীমূলক, কোনটি ঐতিহাসিক আবার কোনটি বা সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ইতিহাস বা মূল বিষয়-বস্তুকে বিকৃত করা হয়নি।

বইটির জন্য দেশী-বিদেশী বহু লেখকের লেখা বইয়ের সাহায্য নিতে হয়েছে। সবগুলি পুস্তকের সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত। সেই সব গ্রন্থের মহান লেখকদের কাছে আমি আমার ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। গুরুদেব শ্রীযুত জ্ঞানদাকান্ত মিশ্র, বন্ধুবর শ্রীযুত অংশুমান পঙ্কাধ্যায়ী আমাকে নানা দিক থেকে সাহায্য করেছেন। পুস্তকটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা কণামাত্র আনন্দ লাভ করলেই নিজের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

ইতি

গ্রন্থকার

Prof. S. M. Chatterjee
PRESIDENT, WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

2, MOTILAL NEHRU ROAD
CALCUTTA-700029

Date

বিজ্ঞানেরও একটি ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস কম চমকপ্রদ নয়। প্রাচীনকালের আমলে মানুষ যুগযুগান্ত ধরে বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন করেছে এবং তা কাজে লাগিয়েছে। পরবর্তী যুগে ক্রমে ক্রমে সেইসকল বিদ্যা প্রযুক্ত ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতে এমন বহু বিদ্যার প্রচলন ছিল যার বিবরণ আজও বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং এ-কথা প্রমাণ করে যে সে-যুগের বিজ্ঞানীবৃন্দ যথার্থই প্রতিভাধর ছিলেন।

শ্রী সুনীলচন্দ্র পাত্র 'প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী' নামক পুস্তকটি রচনা করে বর্তমানে ভুলে-যাওয়া অনেক তথ্য তুলে ধরেছেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞানশিক্ষা আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নূতন পাঠক্রমে। বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা বিষয়ের পুস্তক প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই বইটি পাঠ করে আনন্দলাভ করেছি। আশাকরি, বইখানি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।

সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বইটির জন্য যে সমস্ত পুস্তক এবং পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি—

ভারতকোষ গ্রন্থমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

শিশুভারতী

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের গল্প

জ্ঞানবিজ্ঞান পত্রিকা

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—ডঃ সুকুমার সেন

আয়ুর্বেদ পরিচয়—মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন

হিন্দুজ্যোতির্বিদ্যা—সুকুমাররঞ্জন দাস

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা—রমেশচন্দ্র মজুমদার

পজেটিভ সায়েন্সেস্ অফ্ দি এন্সিয়েণ্ট হিন্দুজ—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

সায়েন্টিস্টস্ অফ্ এন্সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া—ও. পি. জাগগী

সংযোজন

পরিশিষ্ট

বৈদ্য ধন্বন্তরি

কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি বাণপ্রস্থই অবলম্বন করলেন। দীর্ঘদিন ধরে সংসারে তাঁর মন টিকছিল না, তবু প্রজাদের প্রবল বাধায় এতদিন বনে যেতে পারেননি। বিদায়কালে দলে দলে প্রজা, আত্মীয়স্বজন চোখের জলে তাঁর চলার পথকে পিছল করে তুলল; কিন্তু আপন সিদ্ধান্তে তিনি রইলেন অটল। দণ্ড, কমণ্ডলু নিয়ে সেই যে একবস্ত্রে বেরিয়ে গেলেন আর ফিরলেন না।

এরপর বনের ধারে স্রোতস্বতী এক নদীর তীরে পর্ণকুটীরে তাঁর বাস। উপরে অনন্ত আকাশ, নিম্নে শ্যামলা ধরিত্রী। এখানে রাজপথ নেই, নেই নগরের কোলাহল, স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ-হানাহানি। এখানকার বাসিন্দা যারা, তাদের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের দুশ্চিন্তা নেই; চিকিৎসার জন্য ছুটাছুটি নেই; আত্মীয়স্বজনের জন্যে নেই কোন ব্যস্ততা। পুষ্পাভরণে ভূষিতা অরণ্যানী, পাখির কাকলি, নদীর কলতান, বন্যমৃগের চঞ্চল পদচারণা, ফলভার-নম্র বৃক্ষরাজি মুগ্ধ করেছে রাজাকে। তাইতো ভুলে গেছেন নিজের অতীত জীবন, রাজ-সিংহাসন, রাজবেশ ও রাজভোগের কথা। ক্ষুধা পেলে বনের ফলমূল খান। তৃষ্ণায় পান করেন নদীর জল। দিবস রজনী ধ্যান ধারণায় লিপ্ত থাকেন সেই পরমপুরুষকে অন্তরে উপলব্ধি করতে। আজ মনে হয় অদৃশ্য কোন এক যাদুকরের মায়ায় দীর্ঘদিন সংসার-কারাগারে বন্দী ছিলেন তিনি। তাই বন্ধন মুক্তির আনন্দ তাঁর সারা দেহ-মনে। এতদিনে অমৃতের সন্ধান পেয়ে সুখী তিনি—পরিপূর্ণ তিনি।

একটি ইচ্ছা তাঁর অপূর্ণ থেকে গেছে। সংসার-জীবনে অষ্টাঙ্গ

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ। এমন কোন ব্যাধি ছিল না যা উপশম করা ছিল তাঁর অসাধ্য। পৃথিবীতে তাই তিনি পরিচিত ছিলেন ধন্বন্তরি নামে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। এত বড় মহান শাস্ত্রকে অর্পণ করার মত কোন যোগ্য পুরুষ তিনি খুঁজে পাননি। আপন সত্তাকে উত্তরপুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নেওয়াই তো জীবের বৈশিষ্ট্য। দিবোদাস তপস্যার দ্বারা হয়ত পরমগতি লাভ করতে সমর্থ হবেন; কিন্তু যে ধরার ধূলায় এতদিন লীলা-খেলা করে গেলেন সেখানে কি কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারবেন না? মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রচার বোধ করি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

একদিন বসন্ত-সায়াহ্নে পুষ্পিত এক তরুতলে বসে ভাবছিলেন রাজা দিবোদাস। নদীর কলতানের মধ্যে যেন ধ্বনিত হচ্ছিল জীবনের শেষ রাগিণীর সুর। প্রবহমান নদীর স্রোত বার বার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল তাঁকে। হঠাৎ পায়ে কিসের যেন স্পর্শ অনুভব করলেন তিনি। মুহূর্তে ধ্যান ভঙ্গ হল তাঁর। তাকিয়ে দেখলেন এক তরুণ ঋষিকুমার পদপ্রান্তে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বাহু প্রসারিত করে তুলে ধরলেন কুমারকে। ভারী সুন্দর সেই ঋষিকুমার। মস্তকের কেশগুচ্ছ চূড়ার মত উপরের দিকে বাঁধা। প্রশস্ত ললাটে ত্রিপুণ্ড্রকের রেখা, পরণে কাষায় বস্ত্র, বর্ণ সুগৌর। তার ঘন কৃষ্ণ আয়ত চোখ দুটিতে অনাদিকালের জিজ্ঞাসা। প্রশ্ন করলেন, 'কি নাম তোমার সৌম্য, কিই বা তোমার পরিচয়?'

সবিনয়ে জানাল তরুণ, 'আমি মহর্ষি বিশ্বামিত্রপুত্র সুশ্রুত।'

'মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র তুমি!' আরও আশ্চর্য হলেন রাজা। বললেন, 'বল পুত্র, আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?'

হাতজোড় করে সুশ্রুত বললেন, 'শিক্ষার্থী আমি, গুরুর সন্ধানে পৃথিবী পর্যটন করছি। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার দর্শন পেলাম। কৃপা করে আমার শিক্ষার ভার গ্রহণ করুন গুরুদেব।'

তরুণটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন দিবোদাস। এক এক সময় তাঁর মনে হত ইচ্ছা তাঁর অপূর্ণ থাকবে না। কে যেন বলতেন, 'দিবোদাস, মানুষের সদিচ্ছা কোনদিন অপূর্ণ থাকে না। তুমি একদিন না একদিন উপযুক্ত শিষ্যের সন্ধান পাবে।' তাহলে বিশ্বামিত্রপুত্র সুশ্রুতই কি হবে অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বাহক ?

শিষ্যকে একটু পরীক্ষা করতে চাইলেন দিবোদাস। বললেন, 'বৎস, আমি বনবাসী। সংসারের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে আমি পরমব্রহ্মের পদতলে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। তাই আর বিদ্যাচর্চায় আমার কোন আগ্রহ নেই। নিজের অক্ষমতার জন্য আমায় ক্ষমা কর পুত্র।'

ম্লান মুখে বসে রইলেন সুশ্রুত। এক সময় বললেন, 'আমার ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে না গুরুদেব। আমি আপনাকেই যে মনে মনে গুরুরূপে বরণ করেছি।'

দিবোদাস ধীরে অথচ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে চাও বৎস ? আমি তোমাকে সাহায্য করবো। তাছাড়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র তুমি। তোমার নিশ্চিত জানা আছে ব্রহ্মবিদ্যা লাভই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানার্জন। আমার মতে তুমি ভুল পথেই পা দিয়েছ।'

সুশ্রুত বললেন, 'ভগবান্। আমার পিতা মহর্ষি হলেও আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। এমনকি ব্রহ্মর্ষি দিবোদাস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ। বলুন আচার্য, ব্রহ্মকে জানার এও কি একটি সোপান নয় ? জীবকে জানলে এবং সেবা করলে কি ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না ?'

মৃদু হাসলেন দিবোদাস। তারপর সুশ্রুতের মাথায় হাত রেখে বললেন, 'আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি বৎস। আমার বিশ্বাস হচ্ছে তোমার দ্বারাই অষ্টাঙ্গ-আয়ুর্বেদশাস্ত্র পৃথিবীতে প্রচারিত হবে।'

শুভক্ষণে আরম্ভ হল শিক্ষাদান কার্য। সারা জীবনের অধীত বিদ্যা, গুরু দান করলেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে। দীর্ঘদিন পরে শিক্ষা সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন সুশ্রুত। সংহিতার আকারে

লিপিবদ্ধ করলেন গুরুর উপদেশাবলী। সংহিতাটির নাম হল 'সুশ্রুতসংহিতা'। প্রাচীন ভারতের উন্নততর শল্যচিকিৎসা ও কায়চিকিৎসার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

কিন্তু কে এই দিবোদাস ধন্বন্তরি, যাঁর ঋণ বার বার স্বীকার করেছেন সুশ্রুত?

ঋগ্বেদে একজন দিবোদাসের নাম পাওয়া যায়। তিনি ধন্বন্তরি আখ্যা পেয়েছিলেন। তবে সুশ্রুত-বর্ণিত কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরি এবং ঋগ্বেদোক্ত দিবোদাস ধন্বন্তরি একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কোন কোন পুরাণে আছে, বৈদ্য ধন্বন্তরির পিতার নাম ঋষি দীর্ঘতমা এবং পিতামহের নাম শৌণিক। কিন্তু এমনও কিছু পুরাণ আছে যেখানে দিবোদাস এবং ধন্বন্তরিকে এক ব্যক্তি বলে ধরা হয় নি। বিষ্ণুপুরাণ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ, হরিবংশ প্রভৃতির মতে বৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই অনেকের অনুমান অসাধারণ চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ ধন্বন্তরি কাশী-রাজবংশ-সম্ভূত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সুশ্রুতের গুরু দিবো-দাসের পূর্বপুরুষগণও চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন এবং চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য তাঁদের কেউ একজন ধন্বন্তরি আখ্যা লাভ করেছিলেন। সেই থেকে ধন্বন্তরি এঁদের কৌলিক পদবী এবং চিকিৎসাশাস্ত্র বংশের অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। দিবোদাস ধন্বন্তরি-বংশের অধস্তন কোন এক পুরুষ। তবে জ্ঞানের গভীরতায় পূর্বপুরুষদের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অনেক প্রাচীন সাহিত্যে ধন্বন্তরিকে দেব-বৈদ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রামায়ণে আছে দিতি ও অদিতির পুত্রগণের ক্ষীরোদসাগর মন্থনকালে উত্থিত চোদ্দটি প্রতীকের একটি রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ। তাঁর এক হাতে ছিল দণ্ড অপর হাতে কমণ্ডলু। (বিষ্ণুপুরাণের মতে তাঁরই কমণ্ডলুতে ছিল অমৃত।) ইনিই বৈদ্য ধন্বন্তরি। বলা হয়েছে তিনি নারায়ণের অবতার, সর্ববেদে

অধিকারী এবং মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ। শিবশিষ্য তিনি অশ্বিনীকুমারের তিন কন্যাকে বিবাহ করেন ও চোদ্দটি সন্তানের জনক হন। আদি বৈদ্য ও সুশ্রুতের মানসগুরু—মনুসংহিতায় যে কয়জন নিত্য উপাস্য দেবদেবীর কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে তাঁর নাম বাদ পড়েনি। বেদে ধন্বন্তরির উল্লেখ থাকলেও সমুদ্র মন্থনের কথা নেই।

অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে দুটি সম্প্রদায় ছিল। একটি মহর্ষি আত্রেয় প্রবর্তিত আত্রেয়সম্প্রদায় (চরক যাঁর শিষ্য, সেই অগ্নিবেশের গুরু আত্রেয়। জীবকের গুরু বৌদ্ধ আত্রেয় নয়।) অপরটি ধন্বন্তরি প্রবর্তিত ধন্বন্তরিসম্প্রদায়। আত্রেয়-সম্প্রদায় মূলতঃ কায়চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং ধন্বন্তরি-সম্প্রদায় দিয়েছিলেন শল্যচিকিৎসাকে। প্রথম সম্প্রদায়ের ধারক ও বাহক অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত, ক্ষারপাণি প্রভৃতি ঋষি, দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সুশ্রুত, ভোজ, বৈতরণ প্রভৃতি। এঁরা সবাই কাশীরাজ দিবোদাসের শিষ্য। আয়ুর্বেদের বৃদ্ধত্রয়ী হলেন আত্রেয়, সুশ্রুত ও ভাগবত। সুপ্রাচীন অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ঃ-সংহিতা ভাগবতের রচনা।

যাইহোক্ পরবর্তীকালে আবার একাধিক ব্যক্তি ধন্বন্তরি আখ্যা লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাঁরাই বিশেষ নৈপুণ্য দেখাতে পেরেছেন তাঁরাই ধন্বন্তরি। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন ছিলেন চিকিৎসক ধন্বন্তরি। এঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে মৃতেরও প্রাণ দান করতে পারতেন। পুরাণে দেববৈদ্য ধন্বন্তরির সঙ্গে সর্পদেবী মনসার এক দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে, প্রাচীন চিকিৎসা-বিদ্যার সঙ্গে যাদুবিদ্যার ঘনিষ্ঠতা নির্দেশ করাই উপাখ্যানটির মূল লক্ষ্য মনে হয়। সেই অর্থেই মনে হয় মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদের পরম মিত্র শঙ্কুর গাড়ুরীকে বলা হয়েছে ধন্বন্তরি। কথিত আছে, একবার মা মনসা প্রদত্ত বিষ পান করে শঙ্কুর গাড়ুরীর সমূহ শিষ্য মারা গেল। কিন্তু ভয় পেলেন না শঙ্কুর। কি সব মন্ত্রতন্ত্র পড়ে পুনর্জীবন দান

করলেন শিষ্যদের। চিন্তিত মনসা মর্তে পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে আগে ভাগেই সরিয়ে নিয়েছিলেন গাড়ুরীকে। কারণ মনসা ধরে নিয়েছিলেন, পুত্রদের মৃত্যু হলে চাঁদ বাধ্য হয়ে মনসার পূজো করে পুত্রদের ফেরত চাইবেন। কিন্তু ধন্বন্তরি শঙ্কুর গাড়ুরী থাকলে সে আশা নেই। এমন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলেই গাড়ুরী ধন্বন্তরি।

ধন্বন্তরি নাম এখন প্রবচনে পরিণত হয়েছে। কোন চিকিৎসকের প্রশংসা করতে গিয়ে আমরা ধন্বন্তরি শব্দটি ব্যব্যহার করি।

ইতিহাসের অন্ধকার পৃষ্ঠা থেকে ধন্বন্তরির প্রকৃত পরিচয় আজ আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন ভারতে ধন্বন্তরি নামে যে একজন অমিত প্রতিভাধর চিকিৎসকের আবির্ভাব হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

মহর্ষি চরক

প্রাচীনকালে যে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রটি দেশ-বিদেশে সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছিল এবং আজও যা বিশ্ববাসীর বিস্ময়ের বস্তু, সেটি মহর্ষি চরক প্রণীত 'চরকসংহিতা' বা সংক্ষেপে 'চরক'। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই মহাগ্রন্থখানি। দেশী বিদেশী বহু চিকিৎসক নিজস্ব রচনার মধ্যে চরকের বচনকে প্রমাণ বলে উদ্ধৃত করেছেন। সেই চরক যে কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকে কৌতূহলী হতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই কৌতূহলকে চরিতার্থ করতে বিশেষ কোন বিস্তারিত প্রামাণিক তথ্য আজ আর অবশিষ্ট নেই। পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিতে চরক সম্বন্ধে যে অতি সামান্য তথ্য ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে তাই-ই উল্লেখ করতে হয়।

প্রথমে স্মরণ রাখতে হবে যে, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে এ্যালোপাথি ওষুধ সমূহ আবিষ্কারের ইতিহাস অতি অল্প দিনের। প্রথম সূত্রপাত যদিও আজ থেকে কয়েক শ' বছর আগে তথাপি একথা সত্য যে, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কারের পরই এই বিজ্ঞান হয়েছে সমৃদ্ধতম। পূর্বে সব দেশে আয়ুর্বেদেরই প্রচলন ছিল। যার উৎপত্তি স্থল এই ভারতভূমি। আয়ু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় বলে শাস্ত্রটির এইভাবে নামকরণ করা হয়েছিল।

শরীর ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বহু তথ্য বেদের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। কোন কোন পুরাণের মতে আয়ুর্বেদই বেদের সার (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ)। কশ্যপ মুনির মতে বেদ চতুষ্টয়ের পরবর্তী পঞ্চম বেদ হল আয়ুর্বেদ।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা থেকেই শাস্ত্রটির সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দান করেন প্রজাপতিকে। প্রজাপতি শিক্ষা দেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে এই বিদ্যা দেবরাজ ইন্দ্র আয়ত্ত করে দান করলেন বৃহস্পতিপুত্র ঋষি ভরদ্বাজকে। তারপর ভরদ্বাজ থেকে আত্রেয়, আত্রেয় থেকে অগ্নিবেশ এবং অগ্নিবেশ থেকে চরক এই বিদ্যা আয়ত্ত করেন। অগ্নিবেশের পূর্ব পর্যন্ত এই শাস্ত্র কেবল মুখে মুখে অর্থাৎ শ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। প্রথমে এই জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করেন অগ্নিবেশ। সংহিতার আকারে লেখা এই বইটির নাম 'অগ্নিবেশসংহিতা'। পরে বইটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। মনে হয় অগ্নিবেশ শিষ্য মহর্ষি চরক বইটি সম্পাদনা করেন এবং অগ্নিবেশসংহিতার চেয়ে চরকসংহিতা শ্রেষ্ঠ হওয়ায় কালক্রমে প্রথম বইটি লুপ্ত হয়ে যায়।

পূর্বে বলা হয়েছে সংহিতাকার চরক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। পানিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে একজন চরকের নাম পাওয়া যায়। তিনি যদি সংহিতাকার চরক হন তাহলে চরকের কাল হয় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের চীনা অনুবাদেও পাওয়া যায় এক চরকের নাম। এখানে চরককে কুশাণ সম্রাট কনিষ্কের প্রধান চিকিৎসক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মতে চরকের কাল, খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতক। অনেকে তাই দু'জন চরকে বিশ্বাসী। প্রথমজন সংহিতাকার চরক, দ্বিতীয়জন চিকিৎসক চরক। সবই তর্কের বিষয়। তবে চরক ব্যক্তি নামের বদলে গোত্র নাম হওয়ার সম্ভাবনাই তুলনায় বেশী। চরকের নাম দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের পর থেকে। মধ্য এশিয়ার মিন্দাই প্রদেশে 'নবনীতক' নামে একখানি চিকিৎসাশাস্ত্রের পুঁথি পাওয়া গেছে। অনেকের ধারণা নবনীতক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষের দিকে লেখা ; তাতে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে চরকের সিদ্ধান্ত। আরবের অভ্যুত্থানের যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে চরকসংহিতা বহুবার বহু

ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং চরককে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় নবম শতকেও সারাকান ও লাটিন চিকিৎসাবিদ্যায় চরকের বারংবার উল্লেখ রয়েছে। স্বয়ং আল্‌বেরুণীও চরককে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁর পুঁথিশালায় সযত্নে রেখেছিলেন চরকসংহিতার একখানা আরবী অনুবাদ।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, বইখানির এমন কি বৈশিষ্ট্য যার জন্য এককালে দেশে বিদেশে এতখানি সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল ? পূর্বেই বলেছি, এককালে মানুষের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একমাত্র সহায় ছিল আয়ুর্বেদ। আবার আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ পুস্তক চরকসংহিতা। এই গ্রন্থখানিতে মানবশরীর ও বিভিন্ন রোগের এমন বর্ণনা আছে যা আজকের শরীরবিজ্ঞানীদের কাছেও বিস্ময়ের বস্তু। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থখানির কিঞ্চিৎ আলোচনা করলেই স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

চরকসংহিতা আট ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বর্ণিত হয়েছে দ্রব্যের গুণাগুণ। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর বস্তুরাশিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। খনিজ, প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ। এদের আবার ৫০টি বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে। প্রাণীদেহে জীবন্ত বা মৃত অবস্থায় কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর অনুপ্রবেশ ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া কি হয়, এই অংশে রয়েছে তার বিস্তৃত পরিচয়। অর্থাৎ বিশেষ জীবাণুর অনুপ্রবেশই যে রোগের উৎপত্তির মূল কারণ, এ সত্য চরকের আমলে জানা ছিল। কিন্তু জীবাণু সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয়েছে আধুনিক যুগে ডাঃ এড্‌ওয়ার্ড জেনার, লুই পাস্তুর, রবার্ট কথ্‌ প্রভৃতি জগৎ-বরেণ্য মানব-হিতৈষী বিজ্ঞানীদের হাতে।

দ্বিতীয় ভাগ নিদান স্থান। এখানকার আলোচ্য বিষয় নানাবিধ অসুখের লক্ষণ ও পরিচয়। তৃতীয় ভাগ বিমান স্থানে আছে মানুষের দেহ ও মনের পরিচয়। রোগের উৎপত্তি স্থল যে একমাত্র দেহ নয়, মনও যে বহুলাংশে দায়ী সে কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। নিদান স্থানে আলোচনা করা হয়েছে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের কথা।

চতুর্থভাগ শরীরস্থানের আলোচ্য বিষয়, শরীরবিজ্ঞান। এই অংশটি সত্যই বিস্ময়কর। সেই আদিযুগে যখন বিজ্ঞানের কোন শাখাই পুষ্ট হয় নি বলে সাধারণের ধারণা, সেযুগে মনুষ্যশরীর সম্বন্ধে এমন মূল্যবান তথ্য কি করে সংগ্রহ করেছিলেন ভারতীয় শরীর-বিজ্ঞানীরা? হাড়, মাংস-পেশী, শিরা-উপশিরা তো বটেই, হৃৎপিণ্ড, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির পরিচয় যেভাবে প্রদান করা হয়েছে তা' সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর। দাঁত ও নখ সহ শরীরে হাড়ের সংখ্যা ৩৬০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আছে শরীরের অন্যান্য যন্ত্রপাতির বর্ণনা, রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া, শব্দ স্পর্শ ইত্যাদির অনুভূতির কারণ। রক্ত সংবহন সম্বন্ধে চরকসংহিতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, হৃদয় থেকে ধমনীগুলির মাধ্যমে রক্ত সর্বশরীরে সঞ্চালিত হয়, পরে আবার হৃদয়ে ফিরে আসে। গর্ভস্থ শিশুর রক্তপ্রবাহ মায়ের হৃদয়ে ফিরে আসে এবং সেখান থেকে পুনরায় গর্ভস্থ শিশুর হৃদয়ে সঞ্চালিত হয়। ভ্রূণের গঠন ও বিকাশ সম্পর্কে এই একই তথ্য পাশ্চাত্যে আবিষ্কৃত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে স্যার উইলিয়ম হার্ভের দ্বারা। শরীরবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করে চিকিৎসক হওয়া যেত না এমন উল্লেখও চরকে আছে।*

পঞ্চম ভাগের নাম ইন্দ্রিয় স্থান। শরীরের কোন অংশে কোন বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভবিষ্যতে কি রোগ হতে পারে এই অংশে রয়েছে তারই বিশ্লেষণ। ষষ্ঠ ভাগ অসুস্থ ও ওষুধের দীর্ঘ বিবরণ। অসুখ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন্‌টি সাধ্য কোন্‌টি কৌশল সাধ্য, কোন্‌টি কদাচিৎ সাধ্য ও কোন্‌টি অসাধ্য তাও বলা হয়েছে। বর্তমানে দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার বা কর্কট রোগকে চরক অসাধ্য ব্যাধি বলে বর্ণনা করেছেন। শেষ দুই ভাগ অর্থাৎ সপ্তম ও অষ্টম স্থান কেবলমাত্র

---

* শরীরং সর্বথাসর্বং সর্বদা বেদ যো ভিষক্।
আয়ুর্বেদং স কার্ৎস্ন্যেন ন বেদ লোক সুখপ্রদম্॥

চিকিৎসকের প্রতি উপদেশ ও তাদের জন্য এক সুদীর্ঘ শপথবাক্য। চিকিৎসকের কর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে চরক বলেছেন, সমস্ত অন্তর দিয়ে এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন করেও রোগীর উপকার করতে হবে। রোগীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য খুঁটিনাটিভাবে জানতে হবে, কোনক্রমে প্রকাশ করা চলবে না। চিকিৎসার মূল সূত্র ও বিশেষত্ব আলোচনা করতে গিয়ে চরক বলেছেন, যা ব্যধি উপশম করে এবং নূতন ব্যধির সৃষ্টি করে না সেই চিকিৎসাই উপযুক্ত চিকিৎসা।*

চরকসংহিতার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর দার্শনিক মতবাদ। মহর্ষি চরক আত্মা ও আয়ু সম্বন্ধে যে দার্শনিক মতবাদের উপস্থাপনা করেছেন, তাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছে এক নতুন দার্শনিক চিন্তাধারা। পানিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সূত্রে আছে, 'কঠ-চরকাল্লুক'। পানিনির 'কঠ' ও 'চরক' যজুর্বেদের শাখা-বিশেষের প্রবক্তা দু'জন ঋষি বলেই অনেকে মনে করেন। ইনি সংহিতাকার চরক নন। যাঁরা বলতে চান চরক কনিষ্কের সমসাময়িক ও তাঁর চিকিৎসক, তাঁদের উত্তরে বলা যায় যে, এত বড় এক মহান্ চিকিৎসাশাস্ত্রবিদের কথা কলহন্ রচিত কাশ্মীরের 'রাজ-তরঙ্গিনী'তে উল্লেখ নেই কেন? পানিনির ভাষ্যকার ভগবান পতঞ্জলি।

পতঞ্জলির কাল সম্বন্ধে সব পণ্ডিতেরই প্রায় এক মত। পণ্ডিতদের মতে পতঞ্জলি মৌর্য-রাজত্বের শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং শুঙ্গবংশীয় সম্রাট পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে তিনি জীবিত ছিলেন। পুষ্যমিত্র যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন তাতে ঋত্বিক ছিলেন পতঞ্জলি। মহাজ্ঞানী ও মহাদার্শনিক পতঞ্জলি মানুষের ত্রিবিধ দোষ নিবারণের জন্য তিনখানি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছিলেন। মনের দোষ

* যাত্ব্যদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ
যা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরতান্য মুদিরয়েৎ ॥

নিবারণের জন্য 'পাতঞ্জল দর্শন,' বাক্যের দোষ নিবারণের জন্য 'বৈয়াকরণ মহাভাষ্য' এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য 'চরকসংহিতা'র মহাভাষ্য। পতঞ্জলির জীবনীকার চক্রপাণির রচনা থেকে জানা যায় পতঞ্জলি খ্রীষ্টপূর্ব আনুমানিক ১৭৫ অব্দের মানুষ, সেক্ষেত্রে চরক অবশ্যই আরও পূর্ব সময়ের। পতঞ্জলি ছিলেন যোগ মতবাদের প্রবক্তা। এই মতবাদের আটটি পর্যায় যথাক্রমে অয়ম, নিয়ম, বৈরাগ্য, আসন, প্রাণায়ম, প্রত্যাহার, ধ্যান-ধারণ ও সমাধি।

রোগ নিবারণ ও জীবন ধারণ সম্পর্কে মহর্ষি চরকের ধারণা ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খ। পঞ্চভূত—ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, ষড়-স্বাদ—মিষ্ট তিক্ত অম্ল লবণাক্ত কষায় ঝাঁঝালো, সপ্তধাতু—রস শোণিত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র ও ত্রিদোষ—বায়ু পিত্ত কফ এবং শরীর ও মনের উপর তাদের প্রভাব বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নদর্শন, ওষুধের ক্রিয়াশীলতা, বিষের প্রতিষেধক, পথ্যের নিয়মাদি, খাদ্যদ্রব্যের ভৌত। ভেষজ গুণ, ধূমপান ও মদ্যপানের গুণাগুণ, ওষুধ রূপে শীতল ও উষ্ণ জল প্রয়োগের বিধি কোন কিছুই তাঁর নজর এড়ায় নি। তিনি চোখের রোগের ৯৬টি, স্ত্রী অঙ্গের ২০টি এবং অস্বাভাবিক প্রসব ও শিশু রোগের ৭০টি বিভিন্নতার উল্লেখ করেছেন—এই থেকেই বোঝা যাবে এই মহাগ্রন্থ কত পূর্ণাঙ্গ ছিল।

চরকসংহিতা পরে বহুবার সংস্কার করা হয়েছে। প্রথমে খ্রীষ্টীয় নবম শতকে কাশ্মীরী আচার্য দৃঢ়বল ও পরে আচার্য বাগভট্ সংস্কার করেন। দৃঢ়বল চিকিৎসাস্থান অংশটি দীর্ঘায়িত করেন এবং কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থান নামে দুটি নতুন অংশ চরকসংহিতায় সংযুক্ত করেন। আরও কোন কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি চরকসংহিতার পাঠ যোজনা করেছেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

সুশ্রুত ও সুশ্রুতসংহিতা

রামায়ণে আছে—মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে একবার দেবরাজ ইন্দ্র নপুংসকে পরিণত হলেন। বিষণ্ণ দেবতারা ডেকে আনলেন দেব-বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে। তাঁরা একটা হৃষ্টপুষ্ট মেষকে ধরে এনে তার পুরুষাঙ্গ কর্তন করে সন্নিবেশিত করলেন ইন্দ্রের দেহে যথাস্থানে। ইন্দ্র ফিরে পেলেন তাঁর পুরুষত্ব। দেবতারা হলেন আনন্দিত। (মহাভারতেও ঐ একই কাহিনী একটু অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে।)

মহাভারতে যযাতির উপাখ্যানে দেখা যায়, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের অভিশাপে মহারাজ যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। যযাতির ভোগবাসনা তখনও পরিতৃপ্ত হয় নি ; তাই গ্রহণ করলেন পুত্র পুরুর যৌবন। দীর্ঘদিন যৌবন ভোগ করবার পর পুনরায় ফিরিয়ে দিলেন পুত্রকে।

পুরাণাদিতে অন্ধের অন্ধত্ব মোচন, বিকলাঙ্গের অঙ্গ পুনর্গঠনের কাহিনী মোটেই বিরল নয়। এইসব কাহিনী পড়ার সময় স্বভাবতঃই মনে আসে আজকের দিনের উন্নততর শল্যচিকিৎসা 'অধিরোপণ' বা 'ট্রানসপ্ল্যানটেশনের' কথা।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ উপপুরাণাদির কাহিনীগুলিকে অনেকে অবিশ্বাস্য বলে মনে করেন। কিন্তু একটি কথা তাঁরা ভুলে যান যে, কোন সাহিত্য নিছক কল্পনা প্রসূত কিংবা অবাস্তর ঘটনাবিন্যাস নয়। কল্পনার রঙীন তুলির আঁচড় থাকলেও একটা বাস্তব ভিত্তি তার অবশ্যই আছে।

কাহিনীগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ যথেষ্ট আছে,

কিন্তু অধিরোপণ প্রণালী যে তখনকার দিনেও প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ সুশ্রুতসংহিতা; প্রাচীনকালের শল্যচিকিৎসার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, যার রচয়িতা সুশ্রুত। মহাভারতে রয়েছে সুশ্রুতের কথা। তাই অনুমান করা যেতে পারে, বইটি তথা ভারতীয় শল্যচিকিৎসা কত প্রাচীন। মহাভারত থেকে জানা যায়, সুশ্রুত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং শল্যচিকিৎসায় পারদর্শী। সুশ্রুত সম্বন্ধে এর বেশী তথ্য পাওয়া যায় না, পাওয়া সম্ভবও নয়। মহাভারতে সুশ্রুতের নামোল্লেখ থেকে ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে, সুশ্রুতের কাল মহাভারত রচনার বহু পূর্ববর্তী। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক রূপে তা অনুমিত।

অনেকে অনুমান করেন প্রাচীনকালে যোদ্ধাদের দেহে বিদ্ধ শল্য বা তীর উৎপাটন প্রক্রিয়া থেকেই শল্যচিকিৎসার উদ্ভব। সুশ্রুত-সংহিতায় শল্যচিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত একশ একটি মসৃণ ও কুড়িটি তীক্ষ্ণ লৌহঅস্ত্র এবং চোদ্দ রকমের পট্টবন্ধনীর উল্লেখ আছে। শরীরের কোন জায়গায় হাড় ভেঙ্গে গেলে কিংবা স্থানচ্যুত হলে বিশেষ পট্টবন্ধনীর ব্যবস্থা করে চিকিৎসা করা হত। পঙ্গু পা ও হাতকে কর্তন করা, মূত্রাধারে তলপেটে ও মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের কথাও পাওয়া যায় সুশ্রুতসংহিতায়। শালক্যচিকিৎসা নামে আর এক ধরনের শল্যচিকিৎসার কথা বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। চক্ষু, কর্ণ, নাসা কিংবা গলনালীতে অস্ত্রোপচার ছিল এই চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। কর্তিত অঙ্গের স্থানে লোহায় তৈরী কৃত্রিম অঙ্গ স্থাপনের কথাও লিখেছেন সুশ্রুত। নিষ্কাশন, নির্গমন, জটিল অস্থিভঙ্গ, ব্যবচ্ছেদের কথা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করেছেন।

আরও এক ধরনের শল্য-চিকিৎসার কথা উল্লেখ আছে সুশ্রুত-সংহিতায় যার নাম শল্যতন্ত্র-পদ্ধতি। যার সঙ্গে তুলনা করা যায় আজকের দিনের প্ল্যাসটিক সার্জারী বা পুনর্গাঠনিক শল্য-চিকিৎসার। সুশ্রুতের সময় থেকে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের আমল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে এই চিকিৎসার অনুশীলন চলেছিল।

আজকের প্ল্যাসটিক সার্জারী বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি অগঠিত বা পঙ্গু দেহের পুনর্গঠন, শরীরের ক্ষতস্থানের দাগ তুলে দেওয়া, বিকলাঙ্গ শিশুর দৈহিক ত্রুটি দূর করে তার দেহ-সৌষ্ঠবকে ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি। এই প্ল্যাসটিক সার্জারীর উদ্ভাবক ডাঃ আইভারসন নামে এক মার্কিন শল্যচিকিৎসক। সে সম্বন্ধে ভারী সুন্দর একটি গল্পও প্রচলিত আছে।

একদিন ডাঃ আইভারসন বসে আছেন তাঁর চেম্বারে। এমন সময় এক কুড়ি বাইশ বছরের তরুণী এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। ডাক্তার দেখলেন মেয়েটির সারা মুখ কালো কালো বসন্তের দাগে ভর্তি। মুখের শ্রী বলতে এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। মুখ তুলে তাকালেন ডাক্তার। জিজ্ঞাসা করলেন তার আগমনের কারণ। মেয়েটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো—আমার মুখটাকে আগের মত ভাল করে দিন ডাক্তারবাবু। আমি যে মানুষের কাছে এ পোড়ামুখ দেখাতে পারছি না।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো মেয়েটি। চমকে উঠলেন ডাক্তার। দীর্ঘকাল পরে নিজেরই প্রিয়তমা কন্যার শেষ কথাগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি ঘটলো। হৃৎপিণ্ডটাকে যেন কে প্রচণ্ডভাবে একবার নাড়া দিল। তথাপি যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—খুলে বল দেখি মা, কি হয়েছে তোমার ?

মেয়েটি ধরা গলায় যা বললো তা হচ্ছে,—কিছুদিন আগে তার বসন্ত হয়েছিল। দৈবক্রমে সেই মারাত্মক রোগটির কবল থেকে সে মুক্তিলাভ করলেও মুখের লাবণ্যটুকু হারিয়েছে চিরতরে। এই বিশ্রী মুখটাকে নিয়ে সে দিনের বেলায় কোথাও বেরুতে পারে না। একটা অফিসে চাকরী করত। বীভৎস মুখশ্রীর জন্য চাকরীও তার গেছে।

ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন ডাক্তার। চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর একটি প্রিয় ও বীভৎস মুখ। চীৎকার করে যেন বলছে,—

'আমাকে ভাল করে দাও বাবা, আমি যে এ মুখ আর দেখাতে পারছি না।'

ডাঃ আইভারসনের ছিল একটি মাত্র মেয়ে। বড্ড ভালবাসতেন ডাক্তার। মেয়েটিও ছিল বাবা-অন্ত প্রাণ। একদণ্ডও বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। কত সাধ ছিল তাঁর মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী। রসায়ন পড়ে। পাশ করলেই তার বিয়ে দেবেন। মনে মনে পাত্রও ঠিক করে ফেলেছেন।

হঠাৎ ঘটলো এক অঘটন। একদিন ল্যাবোরেটরিতে কাজ করতে করতে ছিটকে পড়লো তীব্র অ্যাসিড তার মুখে। চিকিৎসার গুণে মেয়েটি প্রাণে বাঁচল ঠিকই কিন্তু তার মুখের লাবণ্য চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেল। গোলাপের পাপড়ির মত সুন্দর কমনীয় মুখটা ভরে গেল বীভৎসতায়। মুখশ্রী দেখে শিউরে উঠলো মেয়েটি। শিউরে উঠলেন ডাক্তারও। তথাপি মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তাঁর বুকটা ভরে গেল।

দিন যায়। একদিন উত্তেজিত ভাবে মেয়েটি ছুটতে ছুটতে এসে ডাক্তারের গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো, 'বাবা, তুমি তো ডাক্তার; দাও না আমার মুখটা সেই আগের মত করে।'

ডাক্তার কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। কিছুই করার তাঁর ছিল না। পারলেন না একটি সান্ত্বনার বাণীও উচ্চারণ করতে। এক সময় মেয়েটি চলে গেল; আর ডাক্তার নীরবে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন—অবস্থাটা যেন সাপে ধরা এক পক্ষীশাবকের মায়ের মত।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মেয়েটি করল আত্মহত্যা। একটি ছোট্ট চিরকুটে লিখে গিয়েছিল—বাবা, যে মুখ দেখলে মানুষে ভয় পায়, সে মুখ নিয়ে জনসমাজে বেঁচে থাকা একটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বড় দুঃখে এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলাম।

আজও ভুলতে পারেন নি ডাক্তার জীবনের সেই বিয়োগান্তক অধ্যায়। কুৎসিতা মেয়েটির মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। দেখতে পেলেন নিজের মেয়ের প্রতিচ্ছবি। মন তার উড়ে গেছে কোন এক সুদূর অতীতে।

মেয়েটি প্রশ্ন করলো,—'আমার মুখটা কি ভাল হবে না ডাক্তারবাবু?'

অকস্মাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলেন ডাক্তার। তারপর বললেন,—'আমাকে কয়েকটা দিন সময় দাও মা, দেখি তোমার জন্য কিছু করতে পারি কিনা।'

—'কতদিন?' জিজ্ঞাসা করলো মেয়েটি।

ডাক্তার অনেক ভেবে বললেন,—'একমাস পরে এসো।'

মুখটা নামিয়ে ত্বরিত পদে চলে গেল মেয়েটি। নির্বাক ডাক্তার যতক্ষণ না মেয়েটি দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল ততক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

একমাস থেকে একটি একটি করে দিন কমতে থাকে, আর ডাক্তারের মনে হতাশাও বাড়তে থাকে একটু একটু করে। কত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন, তথাপি একটুও আশার আলো দেখতে পেলেন না। শেষে মাস শেষ হতে আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকী। ডাক্তার কোন পথ দেখতে না পেয়ে এক রকম পাগল হয়ে গেলেন। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কেবল উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ান, কখনও বা ল্যাবরেটরিতে ঢুকে মুখ গুঁজে বসে কি যেন ভাবেন। এইভাবে কেটে গেল আরও দু' এক দিন।

সেদিনও উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ডাক্তার। হঠাৎ দৃষ্টি নিবদ্ধ হল পথের ধারে এক রেড ইণ্ডিয়ানের উপর। রেড ইণ্ডিয়ানটি পথচারী এক ভদ্রলোকের হাতে উল্কি কাটছে। কি মনে করে লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে উল্কি কাটানো দেখতে লাগলেন ডাক্তার।

কাজ শেষ করে এক সময় রেড ইণ্ডিয়ানটি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা

করলো,—'আপনি উল্কি কাটাতে চান ?'

ডাক্তার বললেন,—'আমি দু' হাতেই উল্কি কাটাতে চাই। যদি তুমি আমার একটি হাতের উল্কি তুলে দিতে পার।'

রেড ইণ্ডিয়ানটি ঈষৎ হেসে বললো,—'এ আর এমন কি শক্ত ?'

দু'হাতে উল্কি কাটানো শেষ হলো। ডাক্তার তাঁর একটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন,—'দাও, এবার উল্কিটা তুলে।' লোকটি তখন ডাক্তারের হাতখানাকে নিয়ে যেখানে উল্কি কাটিয়েছিল সেই জায়গাটা ভাল করে পাথর দিয়ে ঘষতে লাগলো। তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও একটি বারের জন্য মুখ বিকৃত হল না ডাক্তারের।

কিছুক্ষণ পরে রেড ইণ্ডিয়ানটি ডাক্তারের হাতে কাপড় বেঁধে দিয়ে বললো,—'তিন চারদিন পরে খুলে দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।'

চারদিন পরে হাতের বাঁধন খুলে অবাক হয়ে গেলেন ডাক্তার। উল্কির দাগ একেবারেই নেই। ঘষা জায়গাটায় নতুন চামড়া গজিয়ে ত্বককে মসৃণ করে দিয়েছে। আবার পরীক্ষায় বসলেন ডাক্তার। দেখলেন চামড়ার কয়েকটা স্তর আছে। যদি কোন ক্ষতের দাগ দ্বিতীয় স্তর অবধি পৌঁছায় তা' হলে ঐ দাগ পরিষ্কার করে দিতে পারলেই নতুন চামড়া গজিয়ে ত্বককে স্বাভাবিক করে দেবে।

ঠিক এক মাস পরে আবার এল মেয়েটি। ডাক্তার পরম [illegible] তাঁর নবলব্ধ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করলেন মেয়েটির উপর। রেড ইণ্ডিয়ানটির মত তিনি পাথর দিয়ে ঘসে দাগগুলোকে পরিষ্কার না করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রোগিণীকে অজ্ঞান করে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। কাছে রাখলেন মেয়েটিকে এবং প্রবল উৎকণ্ঠায় সেই নির্দিষ্ট দিনটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, যেদিন মুখের ব্যাণ্ডেজটি খোলা হবে।

মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। সকালে একরাশ আগ্রহ নিয়ে দুরু দুরু বক্ষে এবং কম্পিত হস্তে ব্যাণ্ডেজ খুললেন ডাক্তার। একি! যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর পূর্ব পরিচিতা এক কুৎসিতা নারীর জায়গায় লাবণ্যময়ী এক যুবতী। যেন রূপকথার

এক রাজকুমারী যাত্নকরের যাত্নদণ্ডস্পর্শে ফিরে পেয়েছে তার পূর্বশ্রী। বুকটা হাল্কা হয়ে গেল ডাক্তারের, পৃথিবীর কোন মেয়েকে আর বীভৎস মুখশ্রীর জন্য আত্মহত্যা করতে হবে না বলে। তবুও কাঁটার মত কি যেন বিঁধতে থাকে ডাক্তারের বুকে; অযথা চোখটা জলে ঝাপ্‌সা হয়ে উঠল। এক সময় ছুটে বেরিয়ে গেলেন সেই রেড ইণ্ডিয়ানটির খোঁজে। কিন্তু সারা শহর তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পেলেন না তাকে। তুঃখে ভেঙে পড়লেন ডাক্তার। তাঁর এই নতুন আবিষ্কারের সমূহ কৃতিত্ব যে রেড ইণ্ডিয়ানটির। ডাক্তার যখন শোকে তুঃখে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন, তখনই দেবদূতের মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে পথ নির্দেশ করে আবার ফিরে গেছে সে স্বস্থানে।

পাশ্চাত্যে এই থেকে সূত্রপাত প্ল্যাসটিক সার্জারী বা পুনর্গাঠনিক শল্যচিকিৎসার। অতি অল্পদিনের মধ্যেই হল এই চিকিৎসার অভাবনীয় উন্নতি। সেই সঙ্গে উন্নতি হতে লাগল অধিরোপণ প্রণালী। অধিরোপণ প্রণালীর উন্নতি এত হয়েছে যে, সদ্য মৃত ব্যক্তির চক্ষুর অচ্ছোদপটল সংগ্রহ করে অন্ধের অন্ধত্বমোচনও করা হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডকেও পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। অধিরোপণের জন্য অনেক ক্ষেত্রে ত্বকের প্রয়োজন হয়। যেমন ধরা যাক, কারো ঠোঁট কিংবা কান কাটা। সে ক্ষেত্রে শরীরের অপর জায়গা থেকে ত্বক এনে কাটা জায়গায় জুড়ে দেওয়া হয়। আবার বিভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতাসম্পন্ন ত্বকেরও প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেমন পোড়া ঘায়ের জন্য পাতলা এবং মুখের জন্য পুরু ত্বকের। 'ডার্মাটোন' নামে এক প্রকার যন্ত্রের দ্বারা প্রয়োজনানুযায়ী উচ্চতাবিশিষ্ট ত্বক সংগ্রহ করে নেওয়া হয়।

প্রাচীন ভারতে এই পদ্ধতি কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল জানা নেই। অধিরোপণ প্রণালী সুশ্রুতের আমল থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। এমন কি ইংরাজ রাজত্বে গোড়ার দিকেও ভারতের কোন কোন শল্যচিকিৎসকের এই প্রণালী অজ্ঞাত ছিল না। শোনা যায়, ইংরাজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের যখন যুদ্ধ হয়, সেই সময় টিপু সুলতান তাঁর এক শকটচালকের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার

নাক কান কেটে নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর আদেশ প্রতি-পালিত হওয়ার এক বছর পরে ঐ শকটচালক পুনার এক শল্য-চিকিৎসকের কাছ থেকে নাক কান পুনরায় জোড়া দিয়ে এনেছিল। সুশ্রুত শল্যতন্ত্রে কাটা নাক অধিরোপণের পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

ভারতের এই অধিরোপণ প্রণালী এককালে সুদূর আরব, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিল। তাইতো বোধহয় আজও কর্তিত নাসার পুনর্গঠন পদ্ধতিতে ডাক্তারী শাস্ত্রে বলা হয় 'ইণ্ডিয়ান রাইনো প্ল্যাস্‌টি'।

সুশ্রুতসংহিতায় শল্যবৈদ্য, ভীষক, বিষহর, কৃত্যহর—চারপ্রকার শল্যচিকিৎসকের কথা বলা হয়েছে। ছাত্রদের বলা হয়েছে প্রথমে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুর উপর অস্ত্র প্রয়োগ করতে, তারপর যথাক্রমে মৃৎপুতুল, মৃত জীবজন্তু ও মানুষের শবদেহের উপর। সবশেষে জীবিত শরীরের অতি বিপজ্জনক স্থানগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে জীবন্ত শরীরের উপর। চরকের মত সুশ্রুতও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন জীবজগতকে তিনি চার ভাগে ভাগ করেন—কীট পতঙ্গ পিপীলিকা, মানুষ জীবজন্তু, পাখি সরীসৃপ, ব্যাঙ। উদ্ভিদ্‌জগতকেও ভাগ করেন চার ভাগে—বনস্পতি, বৃক্ষ, লতিকা ও ওষধি। যেমন উদ্ভিজ্জ বস্তু থেকে বিভিন্ন শক্তির ক্ষার প্রস্তুতি, চাষের জন্য মাটি তৈরি, সোনা রূপা তামা দস্তা প্রমুখ নানান্ ধাতু ও ধাতুযোগের ব্যবহার ও গুণাগুণ, মৎসচাষ ও মৎস গবেষণা, শরীর ও মনের উপর বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন দিক থেকে প্রবাহিত বায়ুর প্রভাব ইত্যাদি। অর্থাৎ এক ধরণের কোষগ্রন্থের মতই ছিল এই সুশ্রুতসংহিতা। পরে আরবী ভাষায় এটি অনূদিত হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সব ক'টি শাখায় এককালে ভারতীয়রা অভাবনীয়ভাবে উন্নতি করেছিল। কিন্তু উত্থানের পর পতন, আলোর পর অন্ধকার পৃথিবীর নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ভারতের এই উন্নততম চিকিৎসা ব্যবস্থা লুপ্ত হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে দেশের বহুস্থানে আরোগ্যশালা ছিল। পরবর্তীকালে

আরোগ্যশালাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের পক্ষে হাতে-নাতে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হল না। দেশে নিরন্তর বিপ্লব ও অভাব অনটন চিকিৎসকদের স্ববৃত্তি পরিত্যাগে বাধ্য করল। পূর্বে চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতির আসন ছিল সমাজের শীর্ষস্থানে। তাঁদের সমূহ প্রয়োজন রাজা এবং জনসাধারণ মেটাতেন। দেশ যখন চরম দুর্দশার সম্মুখীন হল তখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সবাই। অনেক ক্ষেত্রে জাত্যাভিমানবশতঃ চিকিৎসকগণ পরবর্তীকালে রোগীর মল, মূত্র, পুঁজ, রক্ত নাড়াচাড়া করতে ঘৃণা বোধ করতে আরম্ভ করলেন। ফলে শল্যচিকিৎসা ক্ষৌরকারদের বৃত্তি হয়ে দাঁড়াল। যেখানে সুশ্রুত প্রসবে প্রয়োজনে শল্যাস্ত্র প্রয়োগের কথাও বলে গেছিলেন সেই প্রসূতিবিদ্যার মত উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান অর্পিত হল নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোকদের হাতে। পরিশেষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাববশতঃ শবব্যবচ্ছেদও হল লুপ্ত। পরে মুসলমান রাজত্বে রাজাগণ কেবল মাত্র রাজ্য বিস্তারই করে চলেছেন। জনসাধারণের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি সামান্যতম উৎসাহও দেখালেন না। তাই শুধু চিকিৎসাশাস্ত্র নয় অপর বহু মূল্যবান শাস্ত্রও ধীরে ধীরে নিক্ষিপ্ত হল আবর্জনাস্তূপে। খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না বলে বিদেশীরা ভারতের উপর চালিয়েছে একাদিক্রমে শাসন ও শোষণ।

আজকের ভারতবর্ষ, সেদিনের ভারতবর্ষ নয়। এর অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে আজ প্রত্যেকটি ভারতবাসী সচেতন। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঘনীভূত অন্ধকার ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে। তরুণ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ জীবক

প্রাচীন ভারতে মগধ নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন বিম্বিসার। রাজা বয়সে তরুণ হলে কি হবে মস্ত বড় যোদ্ধা তিনি। বুদ্ধিও তেমনি ক্ষুরধার। তাই তো পিতা মহাপদ্ম প্রীত হয়ে মাত্র পনের বছর বয়সের তরুণ পুত্রটির হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ধর্মাচরণে মন দিয়েছিলেন। বিম্বিসার যে কেবল মাত্র বিরাট যোদ্ধা ও বিচক্ষণ নরপতি ছিলেন তা নয় ; অত্যন্ত প্রজাবৎসলও ছিলেন। প্রজাদের অভাব অভিযোগ স্বচক্ষে দেখার জন্যে রাজ্যময় তিনি গোপনে ঘুরে বেড়াতেন।

একদিন রাত্রির অন্ধকারে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে নিয়ে রাজধানী রাজগৃহে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বিম্বিসার। এমন সময় এক নবজাত শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাঁর কানে ভেসে এল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজা। গভীর রাত্রিতে জনমানবহীন রাস্তার প্রান্তদেশ থেকে ভেসে আসা নবজাতকের ক্রন্দনের শব্দ রীতিমত অবাক করলো তাঁকে। সানুচর বিম্বিসার ক্রন্দনের ধ্বনি অনুসরণ করলেন। দেখলেন, পথিপার্শ্বে আবর্জনাস্তূপে পড়ে আছে এক সদ্যোজাত শিশু। হাত পা নেড়ে উচ্চ ক্রন্দনে চারদিক সচকিত করে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করছে। অবাক হলেন রাজা শিশুটিকে দেখে। ঠিক যেন এক দেবশিশু! কিংবা আকাশের পূর্ণচন্দ্রকে কে যেন নিক্ষেপ করে গেছে ঐ আবর্জনার মধ্যে! গলিত দুর্গন্ধ আবর্জনা শিশুর গায়ে কলঙ্কের মতো শোভা পাচ্ছে। স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে নিজ হাতে তুলে নিলেন রাজা সেই নিষ্পাপ শিশুটিকে।

পরদিন প্রভাতে চর-মুখে সংবাদ পেলেন, শিশুটি রাজগৃহের বারবণিতা শালবতীর সন্তান। জন্মমুহূর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে রাজপথের জঞ্জালস্তূপে। ব্যথিত হলেন রাজা এই জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজে।

দিন যায়। রাজ-অন্তঃপুরে শশীকলার মত বাড়তে থাকে শিশু। যেমন রূপ, তেমন তার বুদ্ধি। অল্প বয়সে গুরুর কাছ থেকে বহু বিদ্যাই আয়ত্ত করল বালক। বিম্বিসার বালকের লেখাপড়ার প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখে পাঠিয়ে দিলেন তক্ষশিলায় গুরু আত্রেয়ের কাছে। অবশ্য আত্রেয় ছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতকের মানুষ। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম/৬ষ্ঠ শতকের জীবকের পক্ষে তাঁর কাছে অধ্যয়ন করা সম্ভব কিনা এই বিষয়ে ঐতিহাসিকরা দ্বিমত পোষণ করেন। অতএব জীবকের গুরু বৌদ্ধ আত্রেয়, ভিন্ন ব্যক্তি নিশ্চয়ই।

যখনকার কথা বলছি, তখন ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষা লাভের একটি মাত্র শিক্ষায়তন ছিল। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের পূর্বপারে, পাঞ্জাব রাজ্যে ; তক্ষশিলা তার নাম। দেশ বিদেশের হাজার হাজার ছাত্র আসতো এখানে লেখাপড়া করতে। সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, ধাতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, সঙ্গীত, অভিনয়, ভাস্কর্য—প্রায় সব বিষয়ই এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। শোনা যায়, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পানিনি এবং রাজনীতিজ্ঞ চাণক্য তক্ষশিলারই ছাত্র ছিলেন। মহাভারতও নাকি এইখানে সর্বপ্রথম পঠিত হয়েছিল।

তক্ষশিলার সুখ্যাতি বহুদিনের। তাই বিম্বিসার তাঁর পালিত পুত্রটিকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের নিমিত্ত পাঠালেন সেখানে। বালকটিও দীর্ঘ সাত বছর ধরে গুরু আত্রেয়ের কাছে অধ্যয়ন করল চিকিৎসাশাস্ত্র। একদিন গুরুদেব ভাবলেন, তাঁর এই তরুণ ছাত্রটিকে এবার পরীক্ষা করতে হবে। তাই একদিন শুভক্ষণে ছাত্রকে ডেকে বললেন, "প্রিয় বৎস, আমি কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদকে নিয়ে গবেষণা করতে চাই। দেখতে চাই ঐ অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদগুলোকে মানুষের কোন কাজে লাগানো যেতে পারে কি না। আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।"

বালকটি হাত জোড় করে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইল ; কোন কথা বললো না। গুরুদেব ঈষৎ হেসে বললেন, "আমার ইচ্ছা তুমি

আজ থেকেই কাজে লেগে যাও। সংগ্রহ করে আনো অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদের নমুনা।" গুরুকে প্রণাম করে চিন্তিত মুখে বিদায় গ্রহণ করলো বালকটি। খুঁজে বেড়াতে লাগল সেই সব উদ্ভিদ।

একমাস পরে আবার ডাকলেন গুরুদেব। জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কথা মনে আছে তো বৎস।"

পাংশু মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল বালক। গুরুদেব তখন ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "আমার মনে হয় তুমি কর্তব্যে অবহেলা করেছ।" বালকটি কেঁদে ফেললো। তারপর হাত জোড় করে অনুনয়ের সুরে বললে, "বিশ্বাস করুন গুরুদেব, আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। দয়া করে আমাকে আরও কিছু সময় দিন।" গুরুদেব বললেন, "তবে তাই হোক। আমি তোমাকে একবৎসর সময় দিলাম। তক্ষশীলার এক যোজন (প্রায় আট মাইল) ব্যাসের মধ্যে তুমি তেমন কোন উদ্ভিদ পাও কিনা আর একবার ভাল করে খুঁজে দেখ। মনে রেখো ঐ অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদই হবে তোমার গুরুদক্ষিণা।"

এবারও চিন্তিত মুখে প্রস্থান করলো বালক। দিন, মাস, শেষে বছর কেটে গেল। গুরুদেব আবার ডেকে পাঠালেন। শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "আশা করি এবার তুমি কৃতকার্য হয়েছো, কৈ দাও তোমার গুরুদক্ষিণা।"

গুরুদেবের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লো বালক। কাঁদতে কাঁদতে বললো, "আমাকে ক্ষমা করুন গুরুদেব। তক্ষশিলার চারপাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি ; কিন্তু তেমন কোন উদ্ভিদ পাইনি। দয়া করে আমাকে অন্য কাজের ভার দিন।"

গুরুদেব শিষ্যের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ; দেখলেন বালকের সে সোনার বর্ণ আর নেই। চক্ষু কোটরগত, শরীর অস্থি-চর্মসার। তারপর একসময় শিষ্যকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম বৎস। আমার গুরুদক্ষিণা আমি অনেক আগেই পেয়ে গেছি। আজ আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।"

অভাবিত পুলকে ভরে উঠলো বালকের মন। মুখটা হাসিতে

ঝল্-মল্ করে উঠলো। গুরুর পদ বন্দনা করে বললো, আশীর্বাদ করুন গুরুদেব, মানুষের সেবাই যেন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়।"

—'তথাস্তু।'—বললেন গুরুদেব।

শিক্ষা সম্পূর্ণ করে একদিন সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করলো বালক। যাওয়ার সময় গুরুদেব বললেন, "গুরু আত্রেয়র আশীর্বাদে তুমি হবে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।"

গুরুর আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। এই বালকটিই উত্তরকালে ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক রূপে পূজিত হয়েছিলেন। নাম তাঁর—'জীবক'। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন এবং ভগবান বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক। এঁর খ্যাতিতে সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র মুখর। স্বয়ং বুদ্ধদেব বলতেন—"সর্বকালের সর্বজনপ্রিয় শ্রেষ্ঠ উপাসক।"

বিভিন্ন বৌদ্ধ-পুঁথি থেকে জানা যায়, জীবকের জীবন-কাহিনী ছিল অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ। তক্ষশিলা থেকে পাঠ সমাপ্ত করে ফিরে আসতেই মহাসমাদরে গ্রহণ করলেন রাজা বিম্বিসার। নিজের পার্শ্বচর, উপদেষ্টা ও চিকিৎসক রূপে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। রাজা বিম্বিসার ছিলেন পরম বৌদ্ধ। কথিত আছে, মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে প্রথমে গিয়েছিলেন বৈশালীতে। তারপর আড়ারকালাম ও রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলেন রাজগৃহে। এই রাজগৃহের পূব নাম ছিল গিরিব্রজ। মহাভারত-প্রসিদ্ধ প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট জরাসন্ধের রাজধানী। প্রথম দর্শনেই বিম্বিসার সিদ্ধার্থের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে বার বার তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন রাজগৃহে থেকে যাওয়ার জন্য। সেদিন সিদ্ধার্থ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি। তবে কথা দিয়েছিলেন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে তিনি আবার আসবেন রাজগৃহে। তারপর কেটে গেল দীর্ঘ ছয় বছর। বোধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করে সশিষ্য বুদ্ধদেব সারনাথ হয়ে নব ধর্ম প্রচারে এলেন রাজগৃহে। বিম্বিসার পরম ভক্তিভরে বুদ্ধকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং গ্রহণ করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। সেদিন জীবকও শরণ নিলেন বুদ্ধের পায়ে। বুদ্ধের

অবস্থানের জন্য বিম্বিসার দান করলেন বেণুবন। জীবক দান করলেন এক আম্রবন। উভয়ের মধ্যে এল এক বিরাট পরিবর্তন। যে জীবককে বিম্বিসার মুহূর্তের জন্যও কাছ ছাড়া করতে পারতেন না সেই জীবককেই নিয়োগ করলেন ধর্মপ্রচারের কাজে। জীবক মেতে উঠলেন বৌদ্ধসংঘ স্থাপনায় এবং ধর্মপ্রচারে। কিন্তু তিনি যে চিকিৎসক, সে কথা মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হননি। প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে তিনি রোগী দেখতেন। জনগণের কাছে এতই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন যে, যখন যেখানে যেতেন অগণিত দর্শনার্থী তাঁর জন্য ভীড় করতো। মানুষের ধারণা ছিল জীবকের স্পর্শেই রোগ নিরাময় হয়। এমনও শোনা যায়, দূর থেকে মানুষকে দেখে বলে দিতে পারতেন তার রোগের কথা। শিশু-রোগ-চিকিৎসায় ছিলেন অদ্বিতীয়। তাই তাঁর আর এক নাম ছিল 'কুমারভচ্চ' বা 'কুমারভৃত্য।' কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন রাজকুমার বিম্বিসারের অনুগৃহীত বলে তাঁকে ঐ নামে অভিহিত করা হ'ত।

একবার বুদ্ধ অন্ত্রের রোগে পীড়িত হলেন। ওষুধ গ্রহণে তাঁর ছিল দারুণ আপত্তি। তাই জীবক বুদ্ধের কাছে পাঠিয়ে দিলেন একটি প্রস্ফুটিত শ্বেত পদ্ম। পদ্ম পুষ্প বুদ্ধের পরম প্রিয়। শোনা যায়, পদ্মের ঘ্রাণ নিতেই সেরে গেল তাঁর ব্যাধি।

বুদ্ধের খুল্লতাত পুত্র দেবদত্ত ছিলেন চিরকাল বুদ্ধবিদ্বেষী। বহুবার তিনি বুদ্ধকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। একবার দেবদত্ত বুদ্ধের কাছে প্রেরণ করেছিলেন নালাগিরি নামে এক মত্ত হস্তীকে। বুদ্ধ নালাগিরিকে বশীভূত করলেও পারেননি দেবদত্তকে। হিংস্রতায় মানুষ কোন কোন সময় বন্য পশুকেও ছাড়িয়ে যায়। তাই ব্যর্থ দেবদত্ত একদিন শরবিদ্ধ করলেন বুদ্ধকে। বিষাক্ত শর লেগেছিল বুদ্ধের পায়ে। প্রাণে রক্ষা পেলেও অল্পদিনের মধ্যে ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠে বুদ্ধকে করল শয্যাশায়ী। শিষ্যরা বুদ্ধের যন্ত্রণা দেখে ডেকে পাঠালেন জীবককে। ছুটে এলেন জীবক। তাঁর চিকিৎসার গুণে ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন ভগবান তথাগত। আশ্চর্যের বিষয়, শরীরের

রক্তদুষ্টির ব্যাপারে আজ থেকে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে অর্থাৎ পেনিসিলিন আবিষ্কারের পূর্বেও কোন চিকিৎসা জানা ছিল না। জীবকের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি একাধারে ছিলেন কায়চিকিৎসক, শল্যচিকিৎসক ও শিশুচিকিৎসক।

তাঁর চিকিৎসার কিছু কিছু বিবরণ যা জানা যায় তা হল, পুরাতন ঘী সেবনে তিনি কী ভাবে পাণ্ডু রোগ সারাতেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৈহিক সক্রিয়তার জন্য দৈনিক ব্যায়ামের নির্দেশ দিয়েছিলেন, জনৈক বণিকের মস্তিষ্কের ত্বকে এবং এক তরুণ খেলোয়াড়ের ক্ষুদ্রান্ত্রে শল্যবিদ্যা প্রয়োগ করেছিলেন, ইত্যাদি।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে জীবকের দানও কম নয়। বিম্বিসারের ইচ্ছা ছিল তাঁর পরিবারের সবাই গ্রহণ করুক বৌদ্ধ ধর্ম। জীবকেরও ইচ্ছা ছিল তাই। কিন্তু রাজমহিষী ক্ষেমা এবং রাজপুত্র অজাতশত্রু ছিলেন দারুণ বুদ্ধবিদ্বেষী। ব্যাথিত হয়েছিলেন বিম্বিসার। বিম্বিসারের ব্যথা কাঁটার মত বিঁধেছিল জীবকের গায়ে। জীবকের ধারণা হল যদি রাজমহিষী কোনও প্রকারে একবার বেণুবনে বুদ্ধের দর্শন করেন তা'হলে তিনি বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারবেন না। মনে মনে একটা উপায় স্থির করে নিবেদন করলেন বিম্বিসারকে। খুশী হয়ে চলে গেলেন বিম্বিসার রাজোদ্যানে মহিষী ক্ষেমার সঙ্গে গল্প করতে। এদিকে জীবক তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন রাজকবিকে। রাজকবির মুখে বেণুবনের প্রশস্তি শুনলেন ক্ষেমা। জিজ্ঞাসা করলেন, "বেণুবন কি এতই সুন্দর ?"

"বিশ্বাস না হয়, স্ব-চক্ষে দেখে আসতে পার।" মৃদু হাসলেন বিম্বিসার।

—তা'হলে আমাকে অনুমতি দিন সম্রাট, আগামীকালই যাতে যেতে পারি বেণুবন দর্শনে।

বিম্বিসার এবং জীবক যা চেয়েছিলেন তাই হ'ল। সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে দান করলেন তাঁর অনুমতি।

ক্ষেমা ছিলেন অসাধারণ রূপ-লাবণ্যময়ী। তাই তাঁর ভয়ানক

গর্ব ছিল। রূপবতী রাজমহিষী শতসখী-পরিবৃতা হয়ে চললেন বেণুবন দর্শনে। তাঁদের কলহাস্যে বেণুবন মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠলো। মনে হল যেন অকস্মাৎ পিককুলের সমাগমে বেণুবনে প্রত্যেকটি বৃক্ষের গায়ে লাগল বসন্তের ছোঁয়া। পদ্মাসনে যোগমগ্ন বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ হল। দেখতে পেলেন একদল উন্মত্ত-যৌবনা, লীলায়িত ভঙ্গিমায় এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। মনে মনে হাসলেন বুদ্ধ।

এদিকে ক্ষেমারও নজরে পড়লো বৃক্ষতলে মুদিত-নয়নে উপবিষ্ট এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী; তাঁকে চামর ব্যজন করে চলেছে অপরূপ সুন্দরী এক অপ্সরা। অবাক বিস্ময়ে ক্ষেমা অপ্সরাকে দেখতে লাগলেন। বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি তিল তিল করে সংগ্রহ ক'রে কে যেন গড়ে তুলেছে এই তিলোত্তমাকে। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ক্ষেমা। হঠাৎ দৃশ্যান্তর ঘটতে লাগল। সেই তিলোত্তমার শরীরে এল পরিবর্তন। পরিশেষে পরিণত হল এক কঙ্কালসার বৃদ্ধায়। কোথায় অন্তর্হিত হল তার ঘনকৃষ্ণ কেশদাম—হরিণের মত টানা টানা চোখ—সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। অধরের মধুর হাসিটি কখন বিলীন হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন ক্ষেমা, এক ভয়ঙ্কর নরকঙ্কাল মুখ ব্যাদন করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে; কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন পরিবর্তন হল না। শিউরে উঠলেন ক্ষেমা। বুঝতে পারলেন মানুষের শেষ পরিণতির কথা। ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন বুদ্ধের পায়ে।

জীবকের ইচ্ছা পূর্ণ হল, পূর্ণ হল বিম্বিসারের ইচ্ছা। কিন্তু তাদের কোন চাতুরী খাটলো না অজাতশত্রুর বেলায়। দিন দিন দেবদত্তের প্ররোচনায় আরও বুদ্ধ-বিদ্বেষী হয়ে উঠলেন অজাতশত্রু। শেষে একদিন অতর্কিতে হত্যা করলেন পিতা বিম্বিসারকে, বৌদ্ধধর্মের সমূহ চিহ্ন মুছে দিলেন রাজ্য থেকে। (অনেকের মতে বিম্বিসারকে বন্দী করে রেখেছিলেন অজাতশত্রু, হত্যা করেন নি।) জীবক বোধ হয় এমন চরম বিপর্যয়ের কথা স্বপ্নেও কোনোদিন কল্পনা করতে পারেন নি। দিশেহারা হয়ে গেলেন তিনি। বিশেষতঃ, বিম্বিসারের

মৃত্যু তাঁর জীবনে এনে দিল এক নিদারুণ হতাশা, বুকে এঁকে দিল সুগভীর ক্ষতচিহ্ন। রাজধানী, রাজগৃহ তাঁর কাছে হয়ে উঠলো অসহ্য। একদিন রাজাকে বললেন, "আমি বুদ্ধের দাস। সেই অপরাধে আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর অথবা নির্বাসন দাও।"

অজাতশত্রু কিছুই করলেন না তাঁর, বরং তাঁকে নিযুক্ত করলেন নিজের উপদেষ্টা ও চিকিৎসকরূপে। রাজাদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য জীবকের ছিল না। মনের মধ্যে তুষানল প্রজ্জ্বলিত থাকলেও নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করে যেতে লাগলেন নিজ কর্তব্য। শুধু মাঝে মাঝে প্রার্থনা করতেন, "হে পিতঃ, তোমার আদর্শকে জয়যুক্ত করার শক্তি আমাকে দাও। তোমার অবোধ সন্তানকে ক্ষমা কর।"

অজাতশত্রুকে ক্ষমা করেছিলেন জীবক; কিন্তু ক্ষমা করতে পারলেন না কোশলরাজ প্রসেনজিৎ। যখন শুনতে পেলেন অজাতশত্রু বিম্বিসারকে হত্যা করেছেন এবং তাঁরই ভগিনী কোশলদেবী স্বামী-বিরহ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, তখন স্থির থাকতে না পেরে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে। দুর্ভাগ্য প্রসেনজিতের, হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হলেন তিনি। শেষে কাশীরাজ্য এবং নিজ কন্যাকে অজাতশত্রুর হাতে তুলে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন। কোশলরাজকে পরাজিত করে অজাতশত্রুর সাহস আরও বেড়ে গেল। নির্বিবাদে চালিয়ে যেতে লাগলেন অত্যাচার। রুদ্ধ করলেন বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি।

জীবক উপদেষ্টা থেকেও অজাতশত্রুর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনতে পারলেন না। শেষে একদিন অজাতশত্রুকে বললেন, "আমাকে চরম দণ্ড দিয়ে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্নটুকু মুছে দাও সম্রাট। তোমার দণ্ড যত বড় নিষ্ঠুর হোক না কেন, ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ বলে আমি মাথা পেতে গ্রহণ করবো।"

—"জীবকের যোগ্য দণ্ড যে কি, সে কথা আজও ঠিক করতে পারে নি অজাতশত্রু।"—স্মিতহাস্যে বললেন সম্রাট।

—"তুমি জান না অজাতশত্রু, কি তীব্র যাতনায় আমি অহর্নিশ

দগ্ধ হচ্ছি। আমার প্রাণদণ্ডের বিধান করলে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।"

—"বৌদ্ধরা আমার পরম শত্রু হলেও সাধারণের হিতার্থে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে।" তারপর একটু নীরব থেকে বললেন, "তোমাকে হত্যা করলে আমারই তো ক্ষতি। ব্যাধিগ্রস্ত হলে কে আমাকে রক্ষা করবে ?"

মুখে হাসি ফুটিয়ে জীবক বললেন, "ভগবান বুদ্ধই তোমাকে রক্ষা করবেন অজাতশত্রু।"

মুচকি হেসে অজাতশত্রু বললেন,—"তোমার ভগবান, পিতৃহন্তা অজাতশত্রুকে কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবে না।"

—"তুমি ভুল বলছো সম্রাট, তুমি যা করছ সবই তো তাঁর নির্দেশে।"

—"মিথ্যে কথা।" ক্রুদ্ধ অজাতশত্রু সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। জীবক বললেন,—"রাগ করো না ভাই, সাধারণের কাছে চিরকাল তুমি বুদ্ধবিদ্বেষী হয়েই থাকবে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম জানে তোমার চেয়ে এত বড় ধর্মপ্রচারক আর কেউ নেই।" একটু নীরব থেকে আবার বললেন জীবক,—"তুমি নিশ্চয়ই জান, বাধা না পেলে কোন মহৎ কর্ম সিদ্ধ হয় না। যে কর্মে যত বেশী বাধা, সেই কর্ম তত বেশী দীর্ঘস্থায়ী।"

বিস্মিত অজাতশত্রু বললেন,—"তুমি পাগল হয়ে গেছ জীবক।"

—"পাগল আমি হই নি ভাই। জেনো, অস্ত্র দিয়ে রাজ্য জয় করা গেলেও মানুষের মন জয় করা যায় না। আমাদের কোন সাধ্য ছিল না রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে ভগবান বুদ্ধের বাণী পৌঁছে দেওয়া। তোমার অত্যাচারেই তা' সম্ভব হয়েছে। যদি কোনোদিন কোন বুদ্ধভক্ত এই সিংহাসনে আরোহণ করেন তাহলে সেদিন আসমুদ্র হিমাচল বৌদ্ধধর্মের বন্যায় ভেসে যাবে। আমি মানস-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আজ থেকে অনেক অনেকদিন পরে এই সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছেন এক প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট। অঙ্গে নেই তাঁর রাজবেশ, হাতে নেই তাঁর কোন আয়ুধ। তবুও পৃথিবীর মানুষ দলে

দলে এসে তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছে।"

জীবকের কথাগুলোর মধ্যে যেন যাদু ছিল। চীৎকার করে উঠলেন অজাতশত্রু—"তোমার হেঁয়ালী আমি শুনতে চাই না জীবক! দয়া করে তুমি এখান থেকে চলে যাও।" সেদিন ক্লান্ত অজাতশত্রু ত্যাগ করলেন রাজসভা। কিন্তু জীবকের কথাগুলো বারবার যেন কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সমুদ্রের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস এক সময় স্তব্ধ হয়ে যায়। স্তব্ধ হয় প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত, প্রবল ভূকম্পন, প্রাকৃতিক নিয়মেই থেমে যায়, তেমনি স্বাভাবিক নিয়মেই স্তব্ধ হয়ে এল অজাতশত্রুর বুদ্ধ-বিদ্বেষ। তদুপরি শুনতে পেলেন তার উৎসাহদাতা দেবদত্ত একদিন মুখে রক্ত উঠে মারা গেলেন। বুঝতে পারলেন অজাতশত্রু নিজ কৃতকর্মের পরিণাম। অনুশোচনায় তার মন দগ্ধ হতে লাগলো। প্রথমে ছুটে গেলেন জীবকের কাছে, বললেন, "সারা জীবন ধরে একি করলাম আমি, কে এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করবে দাদা?" শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন অজাতশত্রু।

ঠিক এই মুহূর্তটির জন্য দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করছিলেন জীবক। পরম যত্নে অজাতশত্রুকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "দোষ তো তুমি কর নি ভাই, তুমি যে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধভক্ত।"

পরদিন উষালগ্নে রাহুমুক্ত অজাতশত্রুকে জীবক নিয়ে গেলেন বুদ্ধের কাছে গৃধ্রকূট পর্বতে। অজাতশত্রুর জীবনে এল নতুন প্রভাত। বুদ্ধের স্পর্শে তার সমস্ত মালিন্য ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল।

অল্প কিছুদিন পরেই বুদ্ধ করলেন দেহরক্ষা। বুদ্ধের বাণীকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন জীবক এবং আরও কয়েকজন বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক। তাঁদের নির্দেশে অজাতশত্রু আহ্বান করলেন বুদ্ধের সমূহ শিষ্যদের। গৃধ্রকূট পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায় মিলিত হলেন তাঁরা। এইটিই প্রথম বৌদ্ধ-মহাসম্মেলন।

এরপর জীবক আর বেশী দিন ধরাধামে ছিলেন না। শেষ জীবনটা মনে হয় বৌদ্ধসংঘেই কাটিয়েছিলেন। তাঁর মত প্রকৃত

মানব-দরদী ইতিহাসে দুর্লভ। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু একদিনের জন্যও ভোলেন নি তাঁর কর্তব্য, ত্যাগ করেন নি নিজের পেশা। তাঁর লেখা বিশেষ কোন পুঁথিপত্র পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে কেবল 'বৃদ্ধ-জীবকতন্ত্র' নামে একখানা শিশুচিকিৎসার বই। মনে হয় এটি তাঁরই রচনা। শেষ বয়সে তিনি এটি রচনা করেছিলেন। তাঁর জীবনে যদি সুস্থিরতা থাকতো তাহলে চিকিৎসাশাস্ত্রকে নিয়ে অনেক গবেষণা করতে পারতেন এবং ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র হত আরও সমৃদ্ধ।

মহর্ষি পালকপ্য

এক ছিল নিবিড় বন। তাতে কত যে গাছপালা, লতাগুল্ম আর পশুপাখি ছিল তা গুনে শেষ করা যেত না। বনের মাঝখানে ছিল জটাধারী সন্ন্যাসীর মত আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ো এক বটগাছ। আধখানা বন জুড়ে ছিল তার শাখা-প্রশাখা। ডালে ডালে কোটরে কোটরে রাজ্যের যত পাখি। তলায় হাজার হাজার গর্তে সাতপুরুষ ধরে বাসা বেঁধেছিল কত শেয়াল, খরগোস আর কত বনবেড়াল। আর ছিল ছোট্ট এক পাতার কুঁড়ে। তাতে থাকতেন মহর্ষি পালকপ্য। ঋষির ত্রি-সংসারে আপন বলতে কেউ ছিল না। লোকে বলতো মহর্ষির মা ছিলেন এক হস্তিনী।

যোজনের পর যোজন ধরে বিস্তৃত বিরাট বন। তাতে হিংস্র জন্তু একটিও ছিল না, আর ছিল না পালকপ্য ছাড়া একটিও মানুষ। বড় বড় জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে ছিল কেবলমাত্র একপাল বুনো হাতি। তারাও থাকতো মহর্ষির কুঁড়ের কাছটিতে। ঋষির আপনজন বলতে কেবল ওরাই ছিল।

ভোরবেলায় পাখির কলকাকলিতে যখন ঋষির ঘুম ভেঙে যেত তখনই ছুটে আসতেন হাতির কাছে। তাদের মাথায় গায়ে হাত

বুলিয়ে দিতেন। অসুখ-বিসুখ হলে লতাপাতা, শেকড়-বাকড় এনে খাওয়াতেন। তারপর এক সময় তাদের বনে যাবার জন্য নির্দেশ দিতেন। হাতিরাও মহর্ষির কথা বুঝতো। নিজেদের এবং ঋষির আস্তানা পরিষ্কার করে শুঁড় দোলাতে দোলাতে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে যেত। নিতান্ত যারা শিশু এবং অসুস্থ তারাই পড়ে থাকতো আস্তানায়। হাতিরা চলে যাওয়ার পর ঋষি নিজের ধ্যানধারণা আর পুজো অর্চনা নিয়ে বসতেন।

বিকালে সূর্যদেব যখন পশ্চিমে গিয়ে আকাশের গায়ে আর গাছের মগডালে মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিতেন তখনই ফিরে আসতো হাতির দল। এবারেও মহর্ষি ছুটে যেতেন হাতিদের কাছে। শুঁড়ে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। হাতিরাও আনন্দে মহর্ষিকে ঘিরে নৃত্য জুড়ে দিত।

মহর্ষিকে তারা বড্ড ভালবাসতো। সূর্যের খর তাপে অনাহারক্লিষ্ট গাছপালা যখন আপন চিতা আপনিই রচনা করতো, একফোঁটা জলের জন্য মা বসুন্ধরার বুক ফেটে যখন চৌচির হয়ে যেত, প্রকৃতির তপ্ত শ্বাসে যখন প্রাণীরা পরিত্রাহি রবে চারদিকে ছুটোছুটি করতো, তখন হাতিরা ঋষিকে নিয়ে যেত দশ ক্রোশ দূরে নদীর তীরে। আবার প্রবল বর্ষায় যখন সারা বনভূমি জলে থৈ-থৈ করতো, তখন ঐ হাতিরা সংগ্রহ করে আনতো ঋষির আহারের ফল আর পুজোর ফুল। কনকনে ঠাণ্ডায় যখন ঋষির দাঁতকপাটি লেগে যেত, কুয়াশায় এক হাত দূরের জিনিষও দেখা যেত না, তখন হাতিরা নিয়ে আসতো শুকনো ডালপালা। ঋষি তাতে ধরিয়ে দিতেন আগুন। তারপর বসন্তে যখন গাছপালা কচি কচি পাতায় ভরে যেত তখন তারা মহর্ষিকে পিঠের উপর নিয়ে নাচতে নাচতে বনময় ঘুরে বেড়াত।

কিন্তু চিরদিন তো আর সমান যায় না। আলোর পরে আঁধারের মত সুখের পর দুঃখও আসে। একবার হল কি অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের হাতি পুষতে বড্ড সখ হল। রাজা লোমপাদ একবার অযোধ্যায় গিয়েছিলেন রাজা দশরথের বাড়িতে। অযোধ্যা থেকে

হাতি পোষার নেশা নিয়ে রাজ্যে ফিরলেন রাজা। কিন্তু হাতি পাওয়া যাবে কোথায় ?

পারিষদরা বললেন, এখান থেকে কয়েক যোজন দূরে গভীর বনে থাকেন মহর্ষি পালকপ্য। তাঁর আছে একপাল হাতি। ঋষি কোথাও চলে গেলে রাজা গোপনে তাদের বেঁধে আনতে পারেন। কিন্তু খুব সাবধান; মহর্ষি ভয়ানক রাগী লোক। জানতে পারলে অভিশাপ দিয়ে সবাইকে ভস্ম করে দেবেন।

কথাটা রাজার মনে ধরল। একদিন মহর্ষি পালকপ্য অন্য বনে গেলেন এক ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রাজা অনেকদিন ধরে সেই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। চরমুখে সংবাদ পেয়েই লোক পাঠিয়ে বেঁধে আনলেন সবগুলো হাতি।

সে দেশের লোক কখনও হাতি দেখে নি। সারা রাজপথ লোকে লোকারণ্য। রাস্তার দু'পাশের সব বাড়ির দরজা জানলা খুলে গেল। মেয়েরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। ভুলে গেল রাস্তায় পুরুষ মানুষের উপস্থিতি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটতে ছুটতে এসে হাতি দেখে মুখে আঙুল পুরে সেই যে দাঁড়িয়ে পড়ল আর নড়তে পারল না। রাজা কিন্তু ভারী খুশী। প্রাসাদের কাছটিতে একটা মস্ত বড় খোলা জায়গায় হাতিগুলোকে রাখতে নির্দেশ দিলেন।

দু'দিন পরে ঋষি ফিরে এসে একটিও হাতি দেখতে পেলেন না। ভাবলেন, বুঝি বা সবাই চলে গেছে বনে। ক্রমে সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি এল, তবুও এল না হাতির পাল। অজানা এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বুকটা তাঁর কেঁপে উঠলো। রাত্রির অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে এল; তবুও হাতির পাল ফিরলো না। মহর্ষি আর থাকতে না পেরে কপালে করাঘাত করতে করতে বেরিয়ে পড়লেন বনে। চীৎকার করে ডাকলেন, "ওরে, তোরা কোথায় ? ফিরে আয়, ফিরে আয়।" কিন্তু হাতিরা কি আর আছে যে, তাঁর ডাক শুনবে ? ঋষি যত ডাকেন, ততই তাঁর প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে বন থেকে বনান্তরে; রাতের নীরবতা ভেঙে যায় খান খান হয়ে। ঝোপে ঝাড়ে লেগে পরণের

চীর হ'ল ছিন্নভিন্ন। পা দুটো হল ক্ষত-বিক্ষত। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন গাছের তলায়। চোখ থেকে নেমে এলো অবিরল ধারা। ঠোঁট দু'টো কাঁপতে লাগলো থর থর করে, আর হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল।

অপরাপর দিনের মত সেদিনও সুয্যিঠাকুর জেগে উঠলেন পুব আকাশে, পাখিদের গানে গানে মুখরিত হয়ে উঠল সারা বন। কিন্তু মহর্ষির মনে একটুও সাড়া জাগাল না। চারদিক ঝাপসা দেখতে লাগলেন তিনি। তবুও ক্ষত-বিক্ষত পা দু'টোকে টেনে সোজা করে উঠে দাঁড়ালেন ঋষি। বনের পশুপাখি গাছপালা যাকেই সামনে পেলেন তাকেই জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করলেন—"তোমরা কি আমার সেই প্রিয় হাতিগুলোকে দেখেছ ?"

কিন্তু তারা তো আর কথা বলতে পারে না। ঋষি কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার পথ চলেন। এমনি করে একদিন নয় দু'দিন নয়, কেটে গেল দীর্ঘ একটি মাস। কেঁদে কেঁদে একটি চোখ হল অন্ধ। না খেয়ে শরীর গেল শুকিয়ে। মুখের কাছে যখনই কোন ফল নিতেন, তখনই মনে পড়ে যেত, হাতিরা এর চেয়েও কত সুস্বাদু ফল তাঁকে এনে দিত। যখন ধ্যানে বসতেন, তখন চোখের সামনে ভেসে উঠতো হাতিদের মুখ। ঘুমুতে গেলে দেখতে পেতেন যেন কতকগুলো করুণ চোখ অপলক-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাঁর দিকে। উঠে পড়তেন ঋষি। আর পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়াতেন সারা বনে।

এদিকে রাজা লোমপাদেরও হল মহা বিপদ। একটিও হাতি অন্ন জল ছুঁলো না। রাজা রোজ কত সুখাদ্যই না আনেন তাদের জন্যে তবুও হাতিরা মুখ তুলে একটিবারও তাকায় না। চুপচাপ শুয়ে থাকে আর চোখের জলে নদী ভাসায়। না খেয়ে আর কেঁদে কেঁদে তাদের সবাই হল অসুস্থ। রাজা ভাবলেন মহর্ষিকে না দেখেই হাতিদের এই অবস্থা। এখন উপায় ?

পারিষদদের বললেন রাজা, হয় ঋষিকে নিয়ে এস, নয়তো হাতিদের ছেড়ে দিয়ে এসো বনে। কিন্তু কেউ রাজী হল না, বললো,

—দেখতে পেলে ঋষি আর আস্ত রাখবেন না। অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলবেন।

রাজা বললেন, "তা' হোক, এতগুলো জীবহত্যার চেয়ে মরণ ঢের ভাল।" কিন্তু কাউকেই আর যেতে হল না। হাতিদের খুঁজতে খুঁজতে একদিন ঋষি স্বয়ং এসেই হাজির হলেন লোমপাদ রাজার দেশে। হাতিদের দেখে ঋষির সে কি কান্না। তিনিও যত কাঁদেন, হাতিরাও তত কাঁদে। তাদের কান্না দেখে কাছে-পিঠে যত লোক ছিল তারাও কাঁদতে লাগল। রাজার পোষা পাখিগুলো গান থামিয়ে জুড়ে দিল কান্না। গোশালায় গরু, ঘোড়াশালে ঘোড়া যারাই দেখল এই দৃশ্য, তারাই কেঁদে উঠলো।

রাজার কাছে খবর গেল,—কে এক অস্থিচর্মসার ঋষি এসে হাতিদের ধরে কেবলই কাঁদছেন। রাজা ভাবলেন, এ ঋষি নিশ্চয়ই পালকপ্য। লোকজনদের নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন ঋষির কাছে। ঋষির পায়ে আছাড় খেয়ে বললেন, "ভগবন্! আমি ভয়ানক অন্যায় করে ফেলেছি, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন।"

ঋষি তাকালেন রাজার দিকে, বললেন, "তুমি কেন আমার হাতিগুলোকে চুরি করলে রাজা?"

রাজা বললেন, "আমার অন্যায়ের শাস্তি আমাকে দিন মহর্ষি। কিন্তু তার আগে ঐ হাতিগুলোকে খাইয়ে একটু সুস্থ করে তুলুন।"

রাজা সেই মুহূর্তেই লোকজনদের আদেশ দিলেন রাজ্যে যত ভাল ভাল খাবার আছে সবই নিয়ে আসতে; আর নিজেও ছুটলেন মহর্ষির পাদ্যঅর্ঘ্য আনতে।

রাজার অভ্যর্থনায় খুশী হলেন ঋষি! অভিশাপ দিতে ভুলে গেলেন। রাজা বললেন, "মহর্ষি, আপনি যখন দয়া করে আমার রাজ্যে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন থেকে যান এইখানে। আপনাকে আমি সাতমহলা বাড়ি দেব, হাজার দাস-দাসী দেব আর নদীর ধারে গড়িয়ে দেব সুন্দর তপোবন।"

ঋষি বললেন,—"না।"

ম্লান মুখে বললেন রাজা, "তা হলে হাতিদের কি নিয়ে যাবেন ?"

ঋষি আবার বললেন,—"না।"

"হাতিগুলো না খেয়ে মারা যাবে যে।"

"সে ব্যবস্থা আমি করে যাব।"

ঋষি হাতিদের কাছে গিয়ে তাদের কি যেন বললেন। হাতিরা আনন্দিত হয়ে খেতে লাগল। পরদিন সকালে উঠে মহর্ষি ডাকলেন রাজা লোমপাদকে।

রাজা এলেন, সঙ্গে পারিষদরাও এল। মহর্ষি বললেন, "হাতিদের অনাদর করো না। তাদের অসুখ-বিসুখ হলে কি করতে হবে আমি বলে যাচ্ছি, লিখে নাও।" রাজার আদেশে বোঝা বোঝা তালপাতা এল। পারিষদরা লেখনী হাতে বসে গেল লিখতে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, দু-সপ্তাহ ধরে চললো ঋষির উপদেশ। উপদেশ দিয়ে ঋষি হাতিদের কাছে গিয়ে বললেন, "তোরা রাজার কাছে রাজসুখেই থাকবি। আমি মাঝে মাঝে এসে তোদের খবর নিয়ে যাবো। মন খারাপ করিসনে যেন।" একটু নীরব থেকে আবার বললেন, "এ একরকম ভালই হল। বয়স হয়েছে, আর কতকালই বা তোদের দেখাশুনা করতাম ? তাছাড়া তোদের জন্য আমার জপ তপ সবই যেতে বসেছিল।"

হাতিরা কি বুঝল তারাই জানে। কেবল তাদের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। বনের পশু সোনার পিঞ্জরে আট্‌কে পড়লো। ঋষিও কাঁদছিলেন ! এক সময় বললেন, "তোরা এভাবে কাঁদলে আমিই বা থাকবো কি করে বল ? তার চেয়ে আমিও আসব, তোরাও মাঝে মাঝে বনে যাস।"

ঋষি চলে গেলেন। তাঁর হস্তি-চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেশ রাজা লোমপাদ প্রচার করলেন। নাম হল পালকপ্যসংহিতা। হস্তি-চিকিৎসার এক অনবদ্য পুস্তক। প্রাচীনকালে ভারতে হাতি, ঘোড়া, গরু, এমনকি গাছ-গাছড়ার বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সে সব বইয়ের বেশীর ভাগ আজ লুপ্ত। তবে যে সমস্ত বই

কালজয়ী খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল সেগুলো হল পালকপ্য রচিত হস্তি-চিকিৎসা পুস্তক "পালকপ্যসংহিতা", শালিহোত্র রচিত অশ্ব-চিকিৎসা পুস্তক "শালিহোত্রসংহিতা" বা "তুরঙ্গমশাস্ত্র", গৌতম রচিত গবাদি পশুর চিকিৎসা পুস্তক "গৌতমসংহিতা" এবং শার্ঙ্গধর কৃত "বৃক্ষায়ুর্বেদ"। দ্বিতীয় গ্রন্থটি কালক্রমে ফার্সী, আরবী, তিব্বতী ও ইংরাজিতে অনূদিত হয়।

চক্রপাণিদত্ত

প্রাসাদের এক নির্জন কক্ষ। গৌড়াধিপতি মহারাজ নয়নপালদেব বসে আছেন চিন্তিত মুখে। চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ পরাজিত হয়ে ফিরে গেছেন। রাজ্যে প্রতিটি মানুষ আজ আনন্দিত। কিন্তু আনন্দিত হতে পারছেন না সম্রাট স্বয়ং। এই তো কিছুদিন আগে লক্ষ্মীকর্ণ গৌড় আক্রমণ করে তাঁকে কি অসুবিধাতেই না ফেলেছিলেন। এখন পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেও ভবিষ্যতে এ অপমানের প্রতিশোধ তিনি নেবেনই। ভাগ্য ভাল, দিগ্বিজয়ী বীর রাজেন্দ্রচোলের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পুত্র রাজাধিরাজ চোল চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বরের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকায়, গৌড়ের দিকে তাকাতে সময় পাচ্ছেন না।

গুরুদেব অতীশ দীপঙ্করকে ডেকে পাঠিয়েছেন সম্রাট। চেদিরাজের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য। আজ ভীত তিনি। পাছে তাঁরই হাতে পাল-সাম্রাজ্য পুনরায় ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। পিতা প্রথম মহীপাল বহু কষ্টে পালবংশের সুনাম কিছুটা ফিরিয়ে এনেছিলেন। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারেননি রাজেন্দ্রচোলকে এবং গাঙ্গেয়দেবকে। দিগ্বিজয়ী বীর রাজেন্দ্রচোল শ্রীবিজয় অভিযান নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে ততখানি ক্ষতি করেননি। কিন্তু গাঙ্গেয়দেব ছিনিয়ে নিয়েছেন সমস্ত বারাণসী অঞ্চল। দু' পুরুষ ধরে শত্রুতা। গাঙ্গেয়পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ কি সহজে তাঁকে নিস্তার দেবেন?

গুরুদেব এখনও এসে পৌঁছলেন না। ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন বৃদ্ধ সম্রাট নয়নপালদেব। হঠাৎ দেখতে পেলেন অদূরে একটি সুন্দর ফুটফুটে ছেলে হাঁটু গেড়ে জোড় হাতে বসে আছে অবনত মস্তকে। নিজের চিন্তায় তিনি এত মগ্ন ছিলেন যে বালকটি কখন এসে কক্ষে প্রবেশ করেছে টেরই পাননি। সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তুমি বালক, কি চাও?"

আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে বালক বললো, "আপনার চিকিৎসক ও রন্ধনশালার অধ্যক্ষ নারায়ণদত্তের পুত্র আমি। নাম চক্রপাণি।" মহারাজ দেখতে পেলেন দ্বারদেশে নারায়ণদত্ত দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। মহারাজ হেসে বললেন, "এই সুন্দর ছেলেটি তোমার পুত্র জেনে সুখী হলাম নারায়ণ। কি চায় তোমার পুত্র?"

নারায়ণদত্ত অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "মহারাজের কৃপায় তার কিছুরই অভাব নেই। আজ গুরুগৃহে যাওয়ার প্রাক্কালে মহারাজের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছে।"

খুশিতে ঝলমল করে উঠলো বৃদ্ধ সম্রাটের মুখ। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বালকের কাছে এসে তার শির চুম্বন করে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, "পিতার চেয়েও শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হও। বংশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখো। সর্বশাস্ত্রবিশারদ হও।"

অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন সম্রাট একসময়। ধীরে ধীরে বললেন, "আজ দেশের দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশ আজ দুর্বল। প্রতিবেশী সামন্তরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কয়েকশ' বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত পাল-সাম্রাজ্য হয়ত অচিরে ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরাই পালসাম্রাজ্যের গৌরব বর্ধন কর বৎস। শিক্ষা সমাপন করে একদিন তুমি ফিরে আসবে। সেদিন নয়নপালদেব যদি জীবিত থাকে, তাহলে তাকে একটু দেখো।"

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল বালক। মহারাজ তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন, "শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হও। অনাগত ভবিষ্যতেও মানুষ যেন তোমাকে স্মরণ করে, আর সেই সঙ্গে গৌড়াধিপতি মহারাজ নয়নপালদেবকেও।"

চলে গেল বালক। দীর্ঘ সাত বছর ধরে গুরুগৃহে অধ্যয়ন করলো চিকিৎসাশাস্ত্র। ততদিনে সম্রাট নয়নপালদেব হলেন গত। সিংহাসনে বসলেন তাঁরই পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল। নারায়ণদত্ত তখনও রন্ধনশালার অধ্যক্ষ। তাঁর মত রন্ধনশিল্পে দক্ষ পাল-সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তখনকার দিনে এই বিদ্যা ভালভাবে অধ্যয়ণ করতে হত। চক্রপাণিদত্তও আয়ত্ত করলেন এই বিদ্যা। গুরুগৃহে পাঠ শেষ করে একদিন ফিরে এলেন নিজের দেশে। বিগ্রহপাল ডেকে পাঠালেন সাদরে। বললেন, "পিতা তোমার বৃদ্ধ, চক্রপাণি, আমার ইচ্ছা, পিতার কর্ম তুমি গ্রহণ করে তাঁকে অবসর দান কর।"

চক্রপাণি সবিনয়ে বললেন, "মহারাজের কৃপায় দাস আজ কৃতার্থ। পিতাকে বিশ্রাম দেওয়া পুত্রের অবশ্য কর্তব্য। তথাপি তাঁর অধম সন্তান আমি। এখনও জ্ঞান আমার অসম্পূর্ণ। আপনারই এই অবাধ্য দাসকে নিজগুণে মার্জনা করুন সম্রাট।" একটু নীরব থেকে আবার বললেন, "আমি পরলোকগত মহারাজের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আমাকে আহরণ করতেই হবে।"

খুশী হলেন সম্রাট বিগ্রহপাল। অনুমতি দিলেন আরও জ্ঞান আহরণের জন্য। একদিন শুভক্ষণে চক্রপাণি যাত্রা করলেন মগধে উচ্চশিক্ষা লাভের আশায়। তখন মগধ ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান। পৃথিবীর হাজার হাজার ছাত্র এখানকার সেরা শিক্ষায়তন বিক্রমশীলায় অধ্যয়ন করতো। সে সময়ে ভারতে শিক্ষায়তনের অভাব ছিল না। তার মধ্যে আবার তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী ও সারনাথের খ্যাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। চক্রপাণির সময় তক্ষশীলা ও নালন্দার খ্যাতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছিল ঠিকই কিন্তু বিক্রমশীলার আকাশে তখন মধ্যাহ্ন-রবি। শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন সেখানকার আচার্য। চক্রপাণি আচার্যদেব এবং পণ্ডিতদের তুষ্ট করে একদিন লাভ করলেন বিক্রমশীলায় প্রবেশাধিকার। সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করতে আরও কেটে গেল কয়েক বছর। বিক্রমশীলা থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরলেন না।

চক্রপাণি। ঘুরে বেড়ালেন সারা উত্তর ভারত। জ্ঞানভাণ্ডার করলেন পূর্ণ। সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহপালের আমন্ত্রণে ফিরে এলেন দেশে। কিন্তু তখন পাল-সাম্রাজ্যের গৌরবশশী অস্তমিতপ্রায়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ। বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশ জর্জরিত। তৃতীয় বিগ্রহপাল সর্বশক্তি নিয়োগ করেও রোধ করতে পারলেন না পাল-সাম্রাজ্যের পতন; একদিন ভগ্নহৃদয়ে দেহত্যাগ করলেন তিনি। সিংহাসন নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন বংশধরগণ, শেষে বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল ভ্রাতা রামপাল ও শূরপালকে কারারুদ্ধ করে বসলেন সিংহাসনে। পারিবারিক কলহ সুযোগ করে দিল বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার। সম্রাট দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত কেবল যুদ্ধ করেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শেষে একদিন প্রাণ হারালেন সামন্তদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। সেই সুযোগে কৈবর্তরাজ দিব্যোক প্রতিষ্ঠা করলেন এক শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য।

রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে গৌড়ভূমি ত্যাগ করলেন চক্রপাণি। নগর থেকে দূরে বারেন্দ্রভূমের ময়ূরেশ্চর গ্রামে ছিল তাঁর পিতৃ-পিতামহের আদি নিবাস। সেইখানেই স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে লাগলেন চক্রপাণি। ইতিমধ্যে তাঁর চিকিৎসার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু দূর থেকে রোগীরা আসতো তাঁর কাছে। সারাদিন চিকিৎসা নিয়ে মেতে থাকতেন আর সময় পেলে লিখতেন ভাবীকালের জন্য তাঁর অভিজ্ঞতা। সেই সময়ে চক্রপাণির মত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিজ্ঞানী সারা ভারতে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজির মধ্যে 'চিকিৎসাসংগ্রহ', 'দ্রব্যগুণ' ও 'সর্বসারসংগ্রহ' প্রধান। এই পুস্তকগুলি এককালে সারা ভারতে সমানভাবে আদৃত হয়েছিল। চিকিৎসাসংগ্রহ পুস্তকটির অপর নাম 'চক্রদত্ত'।

চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে এই তিনখানা মৌলিক গ্রন্থ ছাড়াও তখনকার দিনে বহুল প্রচারিত কতকগুলো চিকিৎসাশাস্ত্রের টীকাকারও তিনি। চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার উপর তাঁর দু'খানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ

টীকা 'চরকতত্ত্ব প্রদীপিকা' ও 'ভানুমতী' সারাদেশে এককালে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল। দেশের লোক তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'চরকচতুরানন' ও 'সুশ্রুতসহস্রানন'।

চক্রপাণির বহু পূর্বে বাংলায় আর একজন প্রতিভাধর চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর নাম মাধবকর, মাধব নামেই তিনি ছিলেন অধিক পরিচিত। প্রাচীনকালে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক রচনা করে ভারতব্যাপী খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মাধব অন্যতম। মাধবের মূল্যবান চিকিৎসাগ্রন্থ 'রুগবিনিশ্চয়', বা 'মাধবনিদান'-এর টীকাকারও চক্রপাণি। এই গ্রন্থেই প্রথম বসন্ত রোগ বিষয়ে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত হয়। মাধবাচার্যের পরবর্তী কিন্তু চক্রপাণির পূর্ববর্তী বৃন্দ রচিত 'সিদ্ধযোগ' গ্রন্থের কথাও চক্রপাণি উল্লেখ করেছেন।

চক্রপাণি কেবল মাত্র যে চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন তা নয়। সংস্কৃতসাহিত্য এবং ন্যায়শাস্ত্রেও ছিলেন সুপণ্ডিত। 'ব্যাকরণ-চন্দ্রিকা' নামে তাঁর একখানি ব্যাকরণের গ্রন্থ এবং 'শব্দচন্দ্রিকা' নামে একখানি কোষগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে লেখা তাঁর কোন বই পাওয়া যায় নি। চক্রপাণিদত্তের টীকাকার শিবদাস সেনের 'তত্ত্বচন্দ্রিকা' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে লেখা তাঁর একখানা বই ছিল। তারপর বহু মূল্যবান সামগ্রীর মত এটিও একসময় হারিয়ে গেছে।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী চক্রপাণিদত্ত মুখ্যতঃ ছিলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানী। তাঁর মত অসাধারণ খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক কেবল ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীতেও খুব কম জন্মগ্রহণ করেছেন। মনে হয় একাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মহর্ষি আর্যভট্ট

জীবের ক্রমবির্তনের ধারায় পৃথিবীতে মানুষ এসেছে সর্বশেষে। আবির্ভাবের উষালগ্নে সে ছিল অরণ্যাচারী। কাপড় পরতে, কথা বলতে জানতো না। কাঁচা মাংস খেত। গাছের শাখায় রাত্রি যাপন করতো। হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যানীর মধ্যে বাস করেও বুদ্ধির জোরে টি*কে রইলো সে; অপর দশটা প্রাণীর মত ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল না। তার পরেও চললো হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্ত্তন। ক্রমশঃ বুদ্ধিবৃত্তির হল প্রসার। চিন্তাধারার মধ্যে এল পরিবর্তন। প্রবলতম অনুসন্ধিৎসা, সীমাহীন কৌতূহল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে খু*টিয়ে খু*টিয়ে দেখতে লাগল তার চার-পাশের বস্তুরাশিকে।

প্রথমে বোধ করি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ধরিত্রীর অনন্ত রূপরাশির এবং সীমাহীন মহাকাশ। তাই নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকতো আকাশের ঐ দিগন্তহীন নীলিমার দিকে। ধারণা করলো, পৃথিবীটা থালার মত চ্যাপ্টা এবং এর শেষ প্রান্ত একটা নিশ্চয়ই আছে। আকাশের সূর্য, চন্দ্র ও তারাগুলো কোন এক অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে ক্রীতদাসের মত পৃথিবী পরিক্রমা করছে। মানুষ কল্পনা করল সম্ভব অসম্ভব কত কাহিনী। যেগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে হিন্দু, মিশরীয়, গ্রীসীয় ও আসিরীয় পুরাণে। ভারী মজার সে সব কাহিনী।

হিন্দুরা মনে করতেন পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবীর ব্যাসের সমান উচ্চ এক বিশাল পর্বত। সুমেরু তার নাম। সূর্যদেব সপ্তাশ্ব রথে সুমেরুর চারপাশে নিয়ত পরিক্রমায় রত। সূর্যদেব উত্তরে গেলে সুমেরুর ছায়ায় দক্ষিণে হবে অন্ধকার, আর ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণে গেলে উত্তরে হবে অন্ধকার।

গ্রীকরা মনে করতেন, গ্রীকদেশই হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র।

আটলান্টিক মহাসাগরের অসীম জলরাশি বেষ্টন করে রেখেছে পৃথিবীকে। ভগবান জুপিটারের আদেশে সূর্যদেবতা অ্যাপোলো অশ্ববাহিত রথে রোজই আকাশে চক্কর দিচ্ছেন। সারাদিন ঘোরার পর পরিশ্রান্ত সূর্যদেব আটলান্টিক মহাসাগরের শীতল জলে ডুব দিয়ে দিনের ক্লান্তি দূর করেন।

মিশরবাসীদের কল্পনা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। তাঁরা মনে করতেন পৃথিবীদেবতা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। সূর্যদেবতা আকাশদেবীর পিঠের উপর নৌকোয় করে পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্রে নিত্য ভ্রমণ করছেন। পশ্চিমে আছে পৃথিবীদেবতার মাথা। সূর্যদেবতা সেখানে পৌঁছলেই পৃথিবীদেবতা হাত দিয়ে ঠেলে দেন পূর্বাচলের শিখরে। সেখানে খেয়া নৌকোয় পূর্ব সমুদ্র পেরিয়ে আবার আকাশদেবীর পিঠে নৌকোয় চেপে বসেন।

এমনি কত কষ্ট-কল্পনা। যুক্তিবাদী মানুষের মনে অবিশ্বাসের দোলা হয়তো লাগতো। কিন্তু বিশ্বাস করা ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না সে যুগে।

এইসব কল্পনার মূলে প্রথমে কুঠারাঘাত করলেন পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস। তিনি ভাবলেন, এত দূর থেকে সূর্য, চন্দ্র ও তারাগুলো প্রত্যহ একবার করে পৃথিবীর চার পাশে ঘুরে আসে, এ যে অসম্ভব ব্যাপার। বরং পৃথিবীর পক্ষে নিজ মেরুদণ্ডের উপর দৈনিক একবার করে পাক খাওয়াই স্বাভাবিক। তিনি ধারণা করলেন সূর্য ও তারাগুলো রয়েছে স্থির। পৃথিবীই একটা লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে। তাইতো আকাশের জ্যোতিষ্কগুলোকে ঘুরতে দেখি।

কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত দীর্ঘকাল গোপন রেখে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্বরচিত একটি পুস্তকে প্রকাশ করে গেলেন। গোপন করার কারণ ছিল। সে সময় পুরোহিতরা ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। কোপার্নিকাসের মতবাদ সত্য বলে প্রমাণিত হলে মানুষ আর দেবতা মানবে না, পুরোহিতরা হবেন অসন্তুষ্ট। তাই জীবদ্দশায় পুরোহিতদের বিষনজরে

পড়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে রাজী হননি কোপার্নিকাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেও জনসাধারণ কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। অধিকন্তু টাইকোব্রাহে প্রমুখ কয়েকজন জ্যোতির্বিদ প্রবল আপত্তি তুলে প্রশ্ন করলেন কোপার্নিকাসের মতবাদ যদি অভ্রান্ত হয় তা'হলে উর্ধ্ব থেকে পতিত লোষ্ট্রখণ্ড পশ্চিম দিকে পড়তে দেখা যায় না কেন ?

এরপর কেটে গেল আরও অনেকদিন, পৃথিবীর মানুষ একরকম ভুলে গেল কোপার্নিকাসের কথা। হঠাৎ একদিন পৃথিবীর এককোণ থেকে এক আধপাগলা মানুষ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"সূর্য ঘোরে না, ঘোরে পৃথিবী।" পৃথিবীর মানুষ হতভম্ব হয়ে একবার তাকাল তাঁর দিকে। ইংরেজী ১৬৩২ সাল। এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। পৃথিবী মেনে নিল না তাঁর কথা। উঠল প্রতিবাদের তুমুল ঝড়,—"গ্যালিলিও ধর্মবিরোধী কথা বলেছে, শাস্তি তাঁকে দিতেই হবে। নইলে দেবতার রোষাগ্নি নেমে আসবে পৃথিবীর বুকে।" কিন্তু গ্যালিলিও যে নিজের তৈরী দূরবীণ চোখে লাগিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন গ্রহদের গতিবিধি। গ্যালিলিও বললেন, "না, ভুল তিনি করেন নি।" মানুষ সহজে নিষ্কৃতি দিল না তাঁকে। নিয়ে গেল রাজদ্বারে। সব শুনে সেদিন ক্রুদ্ধ রাজা কারারুদ্ধ করলেন গ্যালিলিওকে। বললেন, ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে গ্যালিলিওর হবে প্রাণদণ্ড। তবে তিনি যদি তাঁর ধারণাকে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন তবে পাবেন মুক্তি। সেদিন প্রাণের ভয়ে গ্যালিলিও স্বীকার করলেন, "পৃথিবী ঘোরে না, ঘোরে সূর্য।"

আরও কেটে গেল বহু বছর। পৃথিবীর মানুষ নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলো কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওর কথা। শেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাবিজ্ঞানী নিউটন আবিষ্কার করলেন 'মহাকর্ষশক্তি' এবং তার নিয়ম কানুন। এতদিনে সব বিতর্কের হল অবসান। পৃথিবীর মানুষ অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করলো গ্যালিলিও এবং কোপার্নিকাসের কথা।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কোপার্নিকাসের হাজার বছর আগে এক

হিন্দু জ্যোতিষী একই তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। বলেছিলেন—"চলা পৃথ্বি স্থিরাভিমি।" আমরা সাধারণত আকাশের নক্ষত্রগুলোকে পরিভ্রমণরত দেখতে পাই। সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর উদাহরণও তিনি দিয়ে গেছেন। বলেছেন—পূর্বদিকে গতিযুক্ত নৌকারূঢ় ব্যক্তি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ বৃক্ষসমূহকে পশ্চিমদিকে যেতে দেখে।* এই জ্যোতিষীর নাম আর্যভট্ট।

টাইকোব্রাহের মত বহু হিন্দু জ্যোতির্বিদও সেদিন সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। বরাহমিহির যিনি আর্যভট্টের প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন তিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থে; পৃথিবী যদি আবর্তন করে তা' হলে উড়ন্ত পাখীরা আপন কুলায় কি করে ফিরে আসে? আর্যভট্টের শিষ্য লল্লও সেদিন সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্তও মেনে নিতে পারেন নি আর্যভট্টের কথা। এমন কি দ্বাদশ শতাব্দীর সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ গণিতাচার্য ও জ্যোতিবিদ ভাস্করাচার্যও কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি আর্যভট্টের কথায়। তাই মনে হয় পৃথিবীর আবর্তনের কথা সে যুগে কোন ব্যক্তিই বিশ্বাস করতেন না।

আর্যভট্টের ছিল না কোন যন্ত্র। তথাপি ধরতে পেরেছিলেন, নিজ মেরুদণ্ডের উপর পাক খেতে খেতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে গোলাকার পৃথিবী। পৃথিবীকেও যে প্রদক্ষিণ করছে চন্দ্র তাও তাঁর অজানা ছিল না। তাইতো সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন সর্বপ্রথম তিনিই। গ্রহণের কারণ অবশ্য বহু পূর্ব থেকে হিন্দু জ্যোতিষীরা জানতেন এবং জানতেন পাশ্চাত্যের বহু দেশ। এমনকি আর্কিমিদিসের পূর্বেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা হিসেব করে গ্রহণের সময় পূর্বাহ্ণে বলে দিতে পারতেন। কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যা আর্যভট্টের আগে কোন বিজ্ঞানী দিতে পারেন নি। তিনিই প্রথম গ্রহণের কারণ হিসেবে

* অনুলোম গতি নৌস্থ' পশ্যত্য চলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিম গানি লঙ্কায়াম্॥

পৃথিবী ও চাঁদের ছায়ার উল্লেখ করেন। চাঁদ যে আসলে অন্ধকার ও সূর্যের আলোয় আলোকিত তাও তাঁর জানা ছিল।

পৃথিবী ও চন্দ্রের কক্ষতলের মধ্যে রয়েছে প্রায় পাঁচ ডিগ্রি কৌণিক ব্যবধান। উভয় কক্ষতল দুটি জায়গায় ছেদ করেছে। ছেদবিন্দু দুটির একটির নাম রাহু অপরটির নাম কেতু। রাহু হচ্ছে উচ্চপাত বিন্দু এবং কেতু নিম্নপাত বিন্দু। এই দুই বিন্দুর যে-কোন একটিতে পূর্ণিমায় চন্দ্র থাকলে হবে চন্দ্রগ্রহণ, অমাবস্যায় থাকলে হবে সূর্যগ্রহণ। মোটা-মুটি গ্রহণের এই ব্যাখ্যাটি আজও সবাই স্বীকার করেন। আর্যভট্টের ধারণাও অনেকটা এই ধরনের।

হিন্দু জ্যোতিষে রাহু ও কেতুর কল্পনা বহু প্রাচীন। এদের চিহ্নিত করা হয়েছে দৈত্যরূপে। তবে এদের সঙ্গে গ্রহণের সম্পর্ক যে অতি নিবিড় সে কথা সমুদ্রমন্থন গল্পটি থেকে কারো উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। কথিত আছে, মহর্ষি দুর্বাসার অভিশাপে স্বর্গ হল লক্ষ্মীছাড়া। লক্ষ্মী বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিয়ে এল দেবতাদের দুর্দিন। তখন সবাই মিলে শরণ নিলেন পরম ভক্তবৎসল আর্তত্রাণকারী ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে। ভগবান উপদেশ দিলেন দেবাসুর মিলে ক্ষীরোদ-সাগরকে মন্থন করতে হবে। তবেই আবির্ভূতা হবেন লক্ষ্মী, দেবতারা ফিরে পাবেন শ্রী। মন্দার পর্বতকে করা হল মন্থনদণ্ড। নাগরাজ বাসুকিকে করা হল রজ্জু। তারপর ভীষণ জোরে মন্থিত হল ক্ষীরোদসাগর। কেঁপে উঠলো স্বর্গ-মর্ত-রসাতল। লক্ষ্মীকে ফিরে পেলেন দেবতারা। সেই সঙ্গে লাভ হল আরও বহু অমূল্য জিনিস। তার মধ্যে ছিল এক কলস অমৃত। ভগবান বিষ্ণু অলক্ষ্যে বসে ভাবলেন অমৃতে অসুরদের আছে ন্যায্য পাওনা ; কিন্তু তারা এমনিতেই ভয়ানক নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির। তার উপর অমৃত পান করে যদি অমরত্ব লাভ করে, তাহলে পৃথিবীতে আর কোন জীবকে বাঁচতে হবে না। অগত্যা চতুর ভগবান গ্রহণ করলেন এক ছলনার আশ্রয়।

ঘটনাস্থলে হঠাৎ আবির্ভূতা হলেন অপরূপ সুন্দরী এক ষোড়শী রমণী। দেব ও দানব সবাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর

দিকে। সেই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা স্মিতহাস্যে তুলে নিলেন অমৃতের কলস। ইশারায় আদেশ করলেন সবাইকে উপবেশন করতে। সুবোধ বালকের মত দেবতা ও অসুরগণ বসলেন পৃথক পৃথক ভাবে। উন্মুখ হয়ে রইলেন অমৃতের জন্যে। তখন সেই রমণী দেবতাদের কাছ থেকে আরম্ভ করলেন পরিবেশন। দেবতারা কেউ বঞ্চিত হলেন না অমৃত থেকে কিন্তু অসুরদের কপালে ছিটে ফোঁটাও জুটল না।

রাহু নামে ছিল চালাক এক অসুর। বোধহয় বিষ্ণুর কারচুপি সে ধরতে পেরেছিল। তাই সে নিজ দলে না বসে, বসে গিয়েছিল দেবতাদের দলে। টের না পাওয়ার জন্যই হোক অথবা গণ্ডগোলের ভয়েই হোক বিষ্ণু তাকেও দিয়েছিলেন অমৃত। অসুরেরা অমৃত না পেয়ে তীব্রভাবে কোলাহল জুড়ে দিল। তখন সূর্য ও চন্দ্র দেখিয়ে দিলেন রাহুকে। বললেন,—"এই দুরাত্মা অসুর চালাকি করে অমৃত পান করেছে।" বিষ্ণু আর কি করেন? আত্মপ্রকাশ করে সুদর্শন দিয়ে কেটে ফেললেন রাহুর মাথা। কিন্তু রাহু তো অমৃত খেয়ে অমরত্ব লাভ করেছে! মাথা কাটলে তার কিই বা এসে যায়? মাথাটা রাহু নামে এবং ধড়টা কেতু নামে আকাশে বিচরণ করতে লাগলো। সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি তার প্রচণ্ড আক্রোশ। সুযোগ পেলেই গিলে ফেলে তাঁদের। সূর্য ও চন্দ্রের তাতে কোন অসুবিধা হয় না। কাটা গলার ভিতর দিয়ে অক্লেশে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসেন। রাহু গিলে ফেললে অল্পক্ষণের জন্য আমরা সূর্য কিংবা চন্দ্রকে দেখতে পাই না, তখন বলি গ্রহণ হল।

কিন্তু পুরাণের এই গল্পটি একটু অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতে। প্রচলিত এই গল্পটি রূপক সন্দেহ নেই। এই থেকে মনে হয় বহু প্রাচীন কাল থেকেই গ্রহণের তথ্যাবলী ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌দের জানা ছিল। কিন্তু প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে এমনও হতে পারে, গল্পটি পরবর্তী কালের একটা সংযোজন মাত্র। কেননা রামায়ণে সমুদ্রমন্থনের কথা থাকলেও রাহুর কথা নেই। সকলেই জানেন গুপ্তযুগে বহু প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ

ও উপপুরাণগুলি পুনর্লিখিত হয়েছিল। আর্যভট্টের আবির্ভাবকালও গুপ্তযুগ। হয়ত তাঁরই আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এই গল্পের পরের অংশটি। ভারতীয় পুরাণ-উপপুরাণগুলোর বহু কাহিনীর অন্তরালে রয়েছে কত ঐতিহাসিক তথ্য, কত আবিষ্কারের কাহিনী।

আর্যভট্ট সম্বন্ধে যা জানা গেছে তা হল, আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে গুপ্তযুগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাটলিপুত্রের অনতি দূরে কুসুমপুরে তাঁর জন্ম। অনেকে আবার মনে করেন, তাঁর জন্মস্থান কেরল, তবে কুসুমপুরে তিনি বাস করতেন। একটি শ্লোকে তিনি নিজেই লিখেছেন, কলিযুগের ৩৬০০ বর্ষে তাঁর বয়ঃক্রম ছিল তেইশ বছর। এই সূত্র থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন তাঁর জন্মকাল ৩৯৮ শকাব্দ বা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। তিনি সব জায়গায়ই ব্যবহার করেছেন কল্যব্দ। শকাব্দ কোথাও ব্যবহার করেন নি।

আর্যভট্ট তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয়গুলো 'আর্যভটীয়' (৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) নামে একটা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এটি বিস্তৃত কোন রচনা নয়, একটি সংক্ষিপ্ত, সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থ। 'আর্যভটীয়' চার অধ্যায়ে বিভক্ত। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার এক অমূল্য সৃষ্টি। বইটিতে আছে মোট ১২১টি শ্লোক। অধ্যায়গুলির নাম কালক্রিয়া, গণিতপাদ, দশগীতিকা ও গোলপাদ। গণিতপাদে বিশুদ্ধ গণিত এবং অন্যান্য পাদে আলোচিত হয়েছে কেবল মাত্র জ্যোতির্বিদ্যা। আর্যভট্টের সুখ্যাতি কেবল মাত্র ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের বাহিরে প্রত্যেকটি সভ্যদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর নাম। গ্রীকদের কাছে তিনি অর্দ্ধবেরিয়স্ এবং আরবীয়দের কাছে আর্জভর নামে পরিচিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ অল্‌বেরুণী বারবার 'কুসুমপুরের আর্যভট্টকে' শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। আর্যভট্টের সুনাম দেশ-বিদেশে এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে, পরবর্তীকালে আরও কেউ কেউ আর্যভট্ট ছদ্মনামে জ্যোতিষশাস্ত্রের বই লিখে গেছেন। তাই একাধিক আর্যভট্টের পরিচয় পাওয়া যায়। কুসুমপুরের মহাজ্যোতিষী আর্যভট্টকে অনেকে তাই প্রথম আর্যভট্ট বলে অভিহিত করেন।

জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে আছে পৃথিবীর আহ্নিকগতির ব্যাখ্যা, বিশেষ কয়েকটি গ্রহের গতিবিধি, গ্রহণের কারণ ও পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ। গ্রহের গতিপথ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি পরাবৃত্ততত্ত্বের উল্লেখ করেছিলেন। গণিতে তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি মনে হয়, বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের সম্পর্ক নির্ণয়। বৃত্ত তা' সে যত বড়ই হোক কিংবা ছোটই হোক, পরিধির পরিমাপকে ব্যাসের পরিমাপ দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা স্থির সংখ্যা পাওয়া যাবে। যার সাংখ্যমান $\frac{২২}{৭}$ বা ৩'১৪২৮৫৭ (প্রায়)। এটি এমন একটি সংখ্যা যেটিকে সেই আর্কিমিদিসের আমল থেকে আজও পর্যন্ত সঠিক ভাবে নির্ণয় করার প্রয়াস অব্যাহত আছে। আর্যভট্টই প্রথম গণিতজ্ঞ যিনি পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের সাংখ্যমান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁর দ্বিতীয় অবদান ত্রিকোণমিতির ব্যবহার। এ ছাড়া বীজগণিত চর্চার সূত্রপাতও হয় তাঁরই হাতে। প্রচূর্ণক বিষয়ে তিনিই প্রথম গাণিতিক ধারণা লিপিবদ্ধ করেন। সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ গ্রীক বীজগণিতবেত্তাদের তুলনায় তিনি ছিলেন অনেক এগিয়ে। আধুনিক গণিতের মূল উপাদানগুলি, যেমন বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়, দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান, সমান্তর শ্রেণীর যোগফল নির্ণয় প্রভৃতি আর্যভট্টেরই অবদান। গণিতে মৌলিক আবিষ্কারগুলি বিভিন্ন সময়ে অনুবাদের মাধ্যমে বিদেশী গণিতজ্ঞদের হাতে পড়ে নব কলেবর প্রাপ্ত হয়েছে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের একটি পদ্ধতিও আর্যভট্ট আবিষ্কার করেছিলেন।

গণিতকে বলা হয় বিজ্ঞানের রাণী। আর সেই গণিতই আবিষ্কৃত হয়েছে ভারতবর্ষে আর্যভট্ট প্রমুখ গণিতজ্ঞের দ্বারা। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কারণ আর্যভটীয়ের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের কৃত্রিম উপগ্রহের নামকরণও করা হয়েছে তাঁর নামে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সব প্রতিভাধর বিজ্ঞানী আজ সাধারণের কাছে প্রায় অপরিচিত।

অত্যন্ত আশার কথা, বর্তমানে বহু ভারতীয় পণ্ডিত প্রাচীন

পুঁথিপত্র নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। চেষ্টা করছেন ভারতের আসল রূপটির সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিতে। আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। অতীতে আমরা যে ভুল করেছি আর সে ভুল যেন ভবিষ্যতে না হয়। তার জন্য আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।

জ্যোতিষ সম্রাট বরাহমিহির

বরাহ, মিহির ও খনা এই নাম তিনটিকে ঘিরে ভারতে কিংবদন্তীর অভাব নেই। সবচেয়ে সুন্দর যে কাহিনীটি প্রচলিত তা সংক্ষেপে এই—

উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় এক উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন বরাহমিহির। জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর মত সুপণ্ডিত সে যুগে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। কিংবদন্তী অনুসারে পিতা বরাহ ও পুত্র মিহির। দুজনকেই একটি রত্ন ধরা হত। প্রথমে নবরত্ন সভায় স্থান পেয়েছিলেন বরাহ; পরে সম্রাট বিক্রমাদিত্য বরাহ পুত্র মিহির ও পুত্রবধূ খনার গুণবত্তায় মুগ্ধ হয়ে মিহিরকে রাজসভায় এনেছিলেন। খনাকেও রাজসভায় স্থান দিতে তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল তবে সে যুগের সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী অন্তঃপুরচারিণীদের প্রকাশ্য রাজসভায় যোগদান নিষিদ্ধ ছিল বলে সম্রাট আপন ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেননি।

কিংবদন্তী সবচেয়ে বেশী জোট বেঁধেছে খনা ও মিহিরকে নিয়ে। কথিত আছে একদিন শুভক্ষণে বরাহের পত্নী (নাম জানা যায় না) প্রসব করলেন সর্বসুলক্ষণযুক্ত একটি পুত্র সন্তান। জ্যোতিষী বরাহ পুত্রের ভাগ্য গণনার জন্য শাস্ত্র খুলে বসলেন। কিন্তু গণনায় স্থির করলেন এই শিশুটি স্বল্পায়ু। বুকটা হাহাকার করে উঠল বরাহের। ভাবলেন এই স্বল্পায়ু পুত্রকে নিয়ে তিনি কি করবেন? আপন পুত্রের

মৃত্যু আপন চোখের সামনে ঘটবে—কেমন যেন অসহ্য মনে হল বরাহের। স্থির করলেন ঈশ্বর প্রদত্ত এই স্বল্পায়ু শিশুকে ঈশ্বরের কোলেই সমর্পণ করবেন। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে যে শিশুর চোখ থেকে পৃথিবীর সমূহ আলো নিভে যাবে তার প্রতি এত মমতার প্রয়োজন কী? ভবিষ্যৎ যার অন্ধকার তাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়।

মনস্থির করে ফেললেন বরাহ। একটি সুন্দর পেটিকার মধ্যে শিশুকে রেখে রাতের অন্ধকারে ভাসিয়ে দিয়ে এলেন সমুদ্রে। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ মুহূর্ত মধ্যে পেটিকাটিকে নিয়ে সরে গেল দূরে—বহুদূরে। নির্বাক এক পাষাণ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন বরাহ। শরীরের শিরা-উপশিরাগুলো কে যেন জোরে টেনে বার করতে লাগল। বুকে অনুভব করলেন শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা। চোখ দুটো ভাদ্রের ভরা নদীর মত টলমল করছিল, পা দুটিকে যেন কোন এক অতিকায় সরীসৃপ সজোরে আকর্ষণ করছিল মাটির ভেতরে। অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত বরাহ কোন রকমে পালিয়ে এলেন।

এদিকে সেই পেটিকাটি ভাসতে ভাসতে একদিন ভিড়ল সিংহলের উপকূলে। সিংহল-সুন্দরীরা তখন স্নান করছিল সাগরকূলে। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল সুন্দর পেটিকাটি! সেখান থেকে আবার ধ্বনিত হচ্ছে নব জাতকের করুণ ক্রন্দন। কৌতূহলী মন নিয়ে এগিয়ে গেল তারা। অবাক হয়ে দেখল চাঁদের কণার মত সুন্দর এক শিশু হাত পা প্রসারিত করে কাঁদছে। ভেবেই পেল না কোন পাষাণ নিষ্ঠুর হাতে বিসর্জন দিয়েছে এমন শিশুকে। একসময় পেটিকা সহ শিশুটিকে তারা হাজির করল রাজার সামনে। সিংহলের রাজা চন্দ্রচূড় যেমন বুদ্ধিমান তেমনই গুণবান। মস্ত বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও। তখন আবার সিংহল ছিল জ্যোতিষী বিদ্যায় অত্যন্ত উন্নত। রাজা শিশুটির প্রকৃত পরিচয় জানার জন্য রাজ-জ্যোতিষীদের গণনা করতে নির্দেশ দিলেন। সাতজন পণ্ডিত সাত ডিবে নস্য খরচ করে সাতদিন পরে একমত হয়ে ঘোষণা করলেন এই শিশু ভারতের শ্রেষ্ঠ

সম্রাট উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক উজ্জ্বল রত্ন জ্যোতিষ-সম্রাট বরাহের পুত্র। বরাহ ভুল করে পুত্রকে স্বল্পায়ু ভেবে নিজ হাতে বিসর্জন দিয়ে গেছেন সাগর জলে। অবাক হলেন রাজা। ভাবলেন মনে মনে এত বড় জ্যোতিষী নিজ পুত্রের বেলায় এত বড় ভুল করে বসলেন! জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ছেলেটি কি তাহলে স্বল্পায়ু নয়? প্রশান্ত হাসিতে ভরে গেল পণ্ডিতদের মুখমণ্ডল। বললেন তাঁরা ঃ আমাদের গণনায় ছেলেটির পরমায়ু শতবছর। আরও বুঝতে পারছি, বরাহ এতদিনে তাঁর ভুল ধরতে পেরেছেন। এখন নিজ নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে কেবল কপালে করাঘাত করছেন আর চেষ্টা করছেন শিশুটি কোথায় আছে তাই নির্ণয় করতে। কিন্তু কিছুতেই স্থির করতে পারছেন না ; সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে।

রাজা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলেন। এদিকে শিশুটি রাজঅন্তঃপুরে মহারাণীর কোলে শশীকলার মত বাড়তে লাগল। ছেলেটির নাম রাখা হল মিহির। দিন যায়। কিছুদিন পরে মহারাণীরও কোলে এল চাঁপাকলির মত সুন্দর ফুটফুটে এক মেয়ে। রাজা সর্বসুলক্ষণযুক্তা কন্যাটির নাম রাখলেন খনা। একই মায়ের কোলে, একই পিতার স্নেহে দুই ভিন্‌দেশী বালক বালিকা খনা ও মিহির একদিন অন্তঃপুরের দ্বার অতিক্রম করে শাস্ত্রপাঠের জন্য বসল গুরুর কাছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও হয়ে উঠল জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী। খনা আবার ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, জ্যোতিষশাস্ত্রে ছাড়িয়ে গেলেন মিহিরকে। বয়স ধীরে ধীরে বাড়ে ; তাদের অবাধ মেলামেশার সঙ্গে বেড়ে চলে অন্তরঙ্গতা, রাজা রাণী কেউই তাদের মেলামেশায় বাধা দান করেন না, পরন্তু এই দুই কিশোর কিশোরীর চঞ্চল পদচারণায় রাজপ্রাসাদটা যখন টলমল করে তখন তাঁরা এক স্বর্গীয় আনন্দের স্বাদ অনুভব করেন।

কিন্তু দিন তো সবসময় সমান যায় না। এমন এক সময় এল যেদিন তারা বুঝতে পারল, একজনের অদর্শন অপরের কাছে অত্যন্ত মর্মান্তিক। খনাই ডেকে বলল মিহিরকে ঃ আমাদের ভালবাসাকে

এবার সামাজিক স্বীকৃতি দিতে হবে মিহির।

মিহির কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল খনার দিকে। পুনরায় খনা বলল: আমার ইচ্ছা, আমাদের ভালবাসার বন্ধন আরও দৃঢ় হোক।

মিহির জিজ্ঞাসা করল: কেমন করে হবে খনা?

: আমাদের এবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। শান্ত অথচ দৃঢ় স্বর খনার। মিহির খুশী হয়ে বলল: তার জন্য চিন্তা কি? এখনই চল পিতামাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করে আসি।

পুনরায় দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করল খনা: সে হবে না মিহির। স্নেহান্ধ পিতামাতা আমাদের বিবাহে কোন আপত্তি করবেন না জানি, তবে কাছ ছাড়াও করতে চাইবেন না।

: তার প্রয়োজন কি খনা? আমরা তো বেশ আছি। বলল মিহির। ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল খনার মুখে। বলল: তুমি জান না মিহির, বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহ প্রশস্ত নয়। তাছাড়া তুমিও কি তোমার জন্মদাতা পিতার সঙ্গে মিলিত হতে চাও না?

উদাস দৃষ্টিতে তাকাল মিহির। খনা বলল: এখনই চল সিংহলেশ্বরীর মন্দিরে। দেবীকে সাক্ষী রেখে আমরা বিয়ে করব। আজ মধ্যাহ্নে মাহেন্দ্রক্ষণ আছে। পিতামাতার অজ্ঞাতসারে আজই আমাদের রওনা হতে হবে ভারত ভূমির দিকে। একটু থেমে আবার বলল খনা: নিজের ভুলে একমাত্র পুত্রকে বিসর্জন দিয়ে পিতা বরাহ অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন। তুমি তাঁর উপযুক্ত পুত্র মিহির। পিতার মনোব্যথা তোমাকেই যে দূর করতে হবে।

খনার কথায় অবাধ্য হতে পারল না মিহির। সেইদিন মধ্যাহ্নেই তারা পা দিল অজানা পথের দিকে। এদিকে তাদের পলায়ন সংবাদ যথাসময়ে কানে এসে পৌঁছল রাজার। আপন কন্যাকে চিনতে রাজার বাকী ছিল না। সর্বহারার ব্যথা প্রাণপণ বুকে চেপে খনার এক প্রিয় সখীকে সম্বোধন করে বললেন: প্রিয় কন্যা আমার! তুমি একটিবার তাদের জানিয়ে এস, আমি ওদের চলার পথে বাধা

দান করে আমার পিতৃস্নেহের অবমাননা করতে চাই না। এতদিন আমি কেবল পিতার কর্তব্যই করেছি। তারা বড় হয়েছে, তাদের স্বাধীন মনোভাবের আমি কোনমতেই বিরোধিতা করতাম না। জানিয়ে এস আমার আন্তরিক আশীর্বাদ। খনাকে বল, আমি তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, যেন শুভ হয় তাদের চলার পথ।

চোখ দুটো জলে ভরে উঠল রাজার। বুকে অনুভব করছিলেন বিরাট এক শূন্যতা। এক সময় পুনরায় বললেন: জ্যোতিষী বিদ্যায় এখনও তাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়নি। তাদের দিয়ে এস এই তিনখানি মূল্যবান গ্রন্থ। বলো তাদের এ বই পৃথিবীর কোথাও নেই, এমনকি সিংহলেও না।

ধীর পদক্ষেপে চলে গেল সখী। ঝড়ে ক্ষত-বিক্ষত পক্ষীশাবকের মত সেইখানে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন রাজা।

পরদিন সিংহলের শেষ প্রান্তে খনার সখী মিলিত হল তার সঙ্গে। জানাল তাকে পিতার আশীর্বাদ—তারপর তুলে দিল উপহার। পিতার প্রদত্ত উপহার সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকাল খনা। শিশির ভেজা অপরাজিতার মত চোখ মেলে খনা তাকাল সখীর দিকে। যেন আপন মনেই উচ্চারণ করল: পিতামাতার বুকে যে ব্যথা আমি দিয়ে এসেছি তাতে কোনদিনই আমার ভাল হবে না। তবুও পিতাকে বল, কুলত্যাগিনী কন্যাকে যেন ক্ষমা করেন। আরও বল যে ব্যথা আমি তাঁকে দিয়ে এসেছি তার শতগুণ ব্যথায় আমি অহরহ দগ্ধ হচ্ছি।

চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল সখী। আর খনা মিহিরও সিংহল পরিত্যাগ করে ভারতের মাটিতে পা দিল। অচেনা-অজানা পথ। বার বার পথ ভুল হয় তাদের। সারাদিন পথ হাঁটে আর রাত্রিতে গাছতলায় বসে জ্যোৎস্নালোকে গণনা করে কোথায়—কতদূরে সেই উজ্জয়িনীর প্রাসাদ শিখর! আর এদিকে চঞ্চল সিপ্রা বিধৌত উজ্জয়িনীর কোন এক প্রাসাদের চূড়োয় উঠে পুত্রবিরহ-যন্ত্রণাকাতর বরাহ আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে তাকিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন, কবে আসবে তাঁর হারানিধি, তাঁর বিসর্জিত

সন্তান। এবার তাঁর গণনা নির্দেশ করছে অতি অল্পদিনে সে প্রবেশ করবে এই উজ্জয়িনী নগরীতে।

খনা ও মিহির উত্তর দিকে পথ চলতে চলতে একদিন প্রবেশ করলো এক গহন বনে। সারাদিন ভয়ানক ঘোরাঘুরি করল তারা, কিন্তু বহির্গমনের পথ পেল না। দিনের শেষে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল গাছের তলায়। ভয় হতে লাগল তাদের না জানি রাত্রে কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পড়ে হারাতে হবে প্রাণ। বিমর্ষ মুখে বসেছিল তারা, কারও মুখে কোন কথা নেই। এমন সময় সেই জনহীন অরণ্যের মধ্যে এক অশ্বারোহীকে দেখে তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গোধূলির রক্তরাঙা আকাশের ছায়া পড়েছিল অশ্বারোহীর পোষাকে, যেন এক দেবদূতের মত মনে হল তাঁকে। সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল তারা। বিস্মিত অশ্বারোহী অশ্ব থেকে অবতরণ করে সেই তরুণ-তরুণীর আপাদ-মস্তক ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে অশ্বারোহীর মনে হল এরা বিদেশী। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই মিহির অনুনয়ের সুরে বলল: আপনি কে দেব? পথভ্রান্ত আমরা, দয়া করে পথের নির্দেশ দিন।

মৃদু হাসলেন অশ্বারোহী। মিহিরের সারল্য মুগ্ধ করল তাঁকে। আরও মুগ্ধ হলেন তাদের চোখে মুখে জ্ঞানের দীপ্তি দেখে। অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করলেন: তোমরাই বা কে? কেনই বা প্রবেশ করেছ এমন গভীর বনে?

কেবলমাত্র বরাহের কথাটা বাদ দিয়ে অপর সব কথা অকপটে নিবেদন করল তারা। আরও বলল জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ তারা, মহান্ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দেখা করতে চায়। অশ্বারোহী এবার পরিচয় দিলেন। বললেন: আমিই উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য—এসেছিলাম শিকারে। পেছনে আছে আমার অগণিত অনুচর। চল তোমরা আমার সঙ্গে।

পরম ভক্তিভরে প্রণাম জানাল বিক্রমাদিত্যকে। এমন অভাবনীয় সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা। কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে

তাকিয়ে রইল সম্রাটের মুখের দিকে।

মমতায় ভরে গেল সম্রাটের মন। সেদিন আর শিকার না করে ফিরে এলেন রাজধানীতে। মনোবাসনা পূর্ণ হল খনা এবং মিহিরের।

শুভক্ষণে একদিন মিলন হল পিতা বরাহের সঙ্গে। পরম যত্নে পুত্র ও পুত্রবধূকে ঘরে তুললেন বরাহ। কিন্তু ফল হল বিপরীত। উজ্জয়িনীর মানুষ বরাহের অজ্ঞতা বুঝতে পেরে ধিক্কার দিয়ে উঠল এবং গুণগান করতে লাগল খনা ও মিহিরের। এমন কি স্বয়ং বিক্রমাদিত্যও খনায় গুণপনায় মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। বরাহের অনুমতি চেয়েছিলেন খনাকে রাজসভায় আনার জন্য। অল্প দিনে বরাহও বুঝতে পেরেছিলেন জ্যোতির্বিদ্যায় তিনি পুত্রবধূর কাছে শিশুমাত্র। তথাপি বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি।

দিন যায়। খনার প্রতিভার পরিচয় একটু একটু করে লাভ করে উজ্জয়িনীবাসী। শ্রদ্ধা তাদের বেড়ে যায় কিন্তু বরাহের মনে জেগে উঠে ঈর্ষা। তথাপি অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে শরণাপন্ন হতে হয় পুত্র-বধূর কাছে। একদিন সম্রাট তাঁর কাছে আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা জানতে চাইলেন। উত্তরটি জানা ছিল না বরাহের। মুহূর্তে আকাশ ভেঙ্গে পড়লো বরাহের মাথায়। উপায় না পেয়ে রাজার কাছ থেকে একদিনের সময় ভিক্ষা করে পাংশুমুখে ফিরে এলেন বাড়িতে। শ্বশুরের পাংশুমুখ দেখে বিব্রত বোধ করল খনা। ভক্তিভরে চরণ-বন্দনা করে জানতে চাইল তাঁর বিষণ্ণতার কারণ। বরাহ সব কথা খুলে বলতেই খনা তৎক্ষণাৎ বসে গেল অঙ্ক কষতে। তারপর এক সময় উত্তরটি বুঝিয়ে দিল শ্বশুরকে।

কিন্তু মানুষের জীবনে অঘটন আসে। সেদিন বরাহ যখন পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন রাজার প্রশ্নের কথা, ঠিক সেই সময় পণ্ডিত বররুচি যাচ্ছিলেন বরাহের বাড়ির পাশ দিয়ে। পরদিন সকাল সকাল রাজসভায় গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, বরাহপণ্ডিত রাজার প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হয়ে পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে বরাহ যখন হৃষ্টমনে রাজসভায় প্রবেশ করছিলেন তখন

চারদিকে উঠল হৈ-হৈ রব। কেউ কেউ মন্তব্য করে উঠল: এবার বরাহ পণ্ডিতের জায়গায় খনাকে রাজসভায় বসান হোক। মুহূর্তে কে যেন একরাশ কালি ছিটিয়ে দিল বরাহের মুখে। তাঁর ধারণা হল খনাই পূর্বাহ্নে রাজার কাছে প্রকাশ করে গেছে বরাহের অসমর্থতার কথা। লজ্জায় অধোবদন হয়ে ফিরে এলেন স্বগৃহে। মিহিরকে বললেন তাঁর চরম অপমানের কথা। পুত্রকে নির্দেশ দিলেন সে যেন স্বহস্তে খনার জিহ্বা কর্তন করে। পিতার ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছিলেন মিহির। বিদুষী খনার জীবনের এইখানে পরিসমাপ্তি।

কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে রূপকথার রাজকুমার ও রাজকুমারীর মত খনা এবং মিহিরের কাহিনী। এইসব কিংবদন্তীর মূলে কোন সত্যতা আছে বলে মনে হয় না। আবার খনা মিহিরের কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশ। কিন্তু কিংবদন্তী বেশী দানা বেঁধেছে বাংলাদেশে। উত্তর প্রদেশের কাছাকাছি সমুদ্রও কোথায় যেখানে বরাহ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শিশুপুত্রকে? তিনি কি বাংলার উপকূলে এসেছিলেন পুত্র বিসর্জন করতে? নাকি ভারতের পশ্চিম উপকূলে গিয়েছিলেন?

যাই হোক না কেন অপর দশটা লৌকিক কাহিনীর মত খনার কথাও বাঙালী মনে গভীর রেখাপাত করে। বাংলার অমূল্য সম্পদ গীতিকাগুলির মতই খনা মিহিরের কাহিনী কোনদিন বাঙালী হৃদয় থেকে নির্বাসিত হবে না। তাই অপূর্ব প্রেম-কাহিনীকে আলোচনার দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করতে প্রাণ চায় না। এর আবেদন যে অনেকখানি।

তবুও বাধ্য হয়ে বলতে হয়, কাহিনীটি আদৌ ঐতিহাসিক নয়। সম্পূর্ণ একটি কিংবদন্তী মাত্র। ইতিহাসকে গুরুত্ব দিলে বলতে হয় বরাহ এবং মিহির একজন ব্যক্তি। বরাহমিহিরের পিতার নাম বরাহ কিন্তু এই বরাহ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় রত্ন ছিলেন না। স্থান পেয়েছিলেন কেবলবাত্র বরাহ-পুত্র বরাহমিহির। পিতার নামকে পুত্রের গ্রহণ করার রীতি আজও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যমান। তাই জ্যোতিষ-সম্রাট বরাহমিহিরের পিতা বরাহ কল্পনা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আর খনার কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে,

খনার বচনে একাধিক বার বরাহমিহিরের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ খনা বরাহমিহিরের পরবর্তী কালের। এই নামে কোন বিদুষী মহিলার আবির্ভাব এক সময় হয়ত ভারতভূমিতে হয়েছিল। তবে তিনি সিংহল-রাজকন্যা কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ, সিংহলরাজ চন্দ্রচূড় ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। আবহবিদ্যা ও জ্যোর্তিষীবিদ্যায় পারদর্শিনী খনা বরাহ-মিহিরের পত্নী ছিলেন কিনা সে বিষয়েও ঠিক করে কিছু বলার উপায় নেই। খনার চরিত্রে বাঙ্গালীদের ছাপই বেশী। হয়ত এক সময় বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন খনা, যাঁর পিতা মাতা বা স্বামীর পরিচয় অজ্ঞাত। খনার বচন নামে যে আকাশতত্ত্ব কৃষিতত্ত্ব প্রচলিত সেগুলির রচনাকাল অনেকের মতে চারশ' বছরের অধিককাল নয়। অধুনাপ্রাপ্ত খনার বচনগুলিও কেবলমাত্র বাংলাভাষায় রচিত, বাংলার মাটি ও কৃষি পদ্ধতিতেই সবচেয়ে প্রযোজ্য। অথচ কিংবদন্তীর খনা সিংহলী, আবির্ভাবকাল আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে। এমনও হতে পারে বরাহমিহির রচিত ফলিত জ্যোতিষের কতকগুলো পুস্তকের সঙ্গে খনার বচনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সৃষ্টি হয়েছে খনা মিহিরের কিংবদন্তীটি। কিংবদন্তীর শক্তি অতি ভয়ানক। রাতারাতি পাখা গজিয়ে উঠে। আবার যদি করুণ কাহিনী কিংবা কোন মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধীয় হয় তাহলে তো কথাই নেই। বাংলার পথে প্রান্তরে যে সমস্ত কিংবদন্তী-মূলক আখ্যান ছড়িয়ে আছে সেইগুলোকে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যাবে। কিংবদন্তী ঐতিহাসিকদের কাছে নিরর্থক, তথাপি সাধারণ মানুষের কাছে এর আবেদন সুদূরপ্রসারী। খনার কাহিনী যাই হোক না কেন আজও বাংলার কৃষক মুখে মুখে খনার বচন আবৃত্তি করে, কলা, নারকেল সুপুরির চারা রোপণ করে, রাই সরষে বোনে। আর অবসর সময়ে তাদের খনামায়ের জন্য দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতেও কসুর করে না। দীর্ঘ দিন ধরে তাই খনা কৃষিজীবিদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার সিংহাসন পেতে বসে আছেন। যতদিন মানুষ কৃষিকাজ করবে ততদিন ভুলবে না খনাকে। কিন্তু খনার আসল পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। খনার বচন দেখে বোঝা যায় খনার মত আবহতত্ত্ববিদ ও

কৃষিবিজ্ঞানী সত্যই দুর্লভ, এর সঙ্গে সংস্কৃত রচনা 'কৃষি প্রসারে'র যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বহু পণ্ডিতের মতে খনা আদৌ কোন মহিলা নন, অবশ্যই পুরুষ।

এবার বরাহমিহিরের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। বরাহমিহির ছিলেন অবন্তিনগরের লোক। জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও অঙ্কশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। বরাহমিহির যাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন বলে কিংবদন্তী সেই রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঘিরেও ভারতে কিংবদন্তীর অভাব নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বেশ কয়েকজন রাজাই বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। অনেকের মতে কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য অর্থাৎ মহাকবি কালিদাস প্রভৃতি যাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন তিনি গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ঐতিহাসিকদের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছুপূর্বে পরলোকগমন করেন। কিন্তু বরাহমিহিরের মৃত্যু হয় ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাহলে বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভায় কোন্ বরাহমিহির ছিলেন ? এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বহু যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন। তাঁদের তর্ককে প্রাধান্য দিলে বরাহমিহির কোথায় হারিয়ে যাবেন। আবার লোকোত্তর কবি-প্রতিভার অধিকারী মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল নিয়েও সংশয় কম নেই। বোঝা যাচ্ছে সাল তারিখের হাঙ্গামা করতে গেলে বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, বরাহমিহির কারও হদিস পাওয়া যাবে না। তবে অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর রেখার মত একটি জিনিস যা আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে সেটি উজ্জয়িনী নগরী। বিক্রমাদিত্য, কালিদাস, বরাহমিহির সবাই উজ্জয়িনী নামের সঙ্গে জড়িত। কালিদাসের জন্মস্থান কোথায় জানা না গেলেও বরাহমিহিরের জন্মস্থান অবন্তিনগর। এই অবন্তিনগরই মগধের উজ্জয়িনী। অবন্তি প্রাচীন মালবের রাজধানী। পুরাণমতে মহাদেবের সঙ্গে ত্রিপুরাসুরের যুদ্ধ হয়েছিল অবন্তিনগরে। মহাদেবের যুদ্ধ জয়ের ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য অবন্তিশহরের নামকরণ করা হয়েছিল উজ্জয়িনী। বরাহমিহির হয়ত উজ্জয়িনীর বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু বিক্রমাদিত্যের

সভায় ছিলেন কি না সঠিকভাবে জানা যায় না। জ্যোতিষ-সম্রাট বরাহমিহির যদি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শত বছর পরে আবির্ভূত হয়ে থাকেন তাহলে কেমন করে সম্ভব? এমনও হতে পারে নবরত্ন সভার বরাহমিহির এবং প্রসিদ্ধ "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" গ্রন্থের রচয়িতা বরাহমিহির (আনুমানিক ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম, পিতার নাম আদিত্য দাস) সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। তাই বরাহমিহিরের জীবনকাহিনী অন্ধকারাবৃত। ভারতীয় সেক্সপীয়র কালিদাসের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এঁদের কারও জীবনকাহিনী আজ আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কেবল তাঁদের লোকোত্তর প্রতিভার কথাই চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে ভারতবাসী।

ভারতীয় জ্যোতিষে বরাহমিহিরের দান খুব কম নয়। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তক "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" নামে অমূল্যগ্রন্থ (৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ) অধুনালুপ্ত সূর্যসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, পৌলিশসিদ্ধান্ত, পৈতামহসিদ্ধান্ত এবং বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত নামে পাঁচটি সিদ্ধান্ত পুস্তক নিয়ে রচিত মহান্ গ্রন্থ পঞ্চসিদ্ধান্তিকা। জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত এমন অদ্বিতীয় পুস্তক প্রাচীনকালে কোন জাতি রচনা করতে পারেননি। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বর্ণনা করা হয়েছে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি আর আছে গ্রহণ সম্বন্ধে অমূল্য তথ্য। বরাহমিহিরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতীয় পঞ্জিকা সংশোধন, তিনিই বর্ষারম্ভ গণনা করেন বৈশাখ থেকে। আগে মধু ও মাধব বা চৈত্র ও বৈশাখ মাসকে বসন্ত ঋতুর মাস বলে ধরা হত। বরাহমিহির সংশোধন করে বৈশাখকে গ্রীষ্ম ঋতুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। পৃথিবীর অয়নচলন হেতু পরবর্তীকালে সব ঋতুগুলোর মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল। তার জন্য বরাহমিহির নতুন পঞ্জিকা রচনা করেছিলেন। বর্তমানে প্রচলিত ভারতীয় পঞ্জিকা বরাহমিহিরের অবদান। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থে সবই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। তাই ফলিত জ্যোতিষে আজও পর্যন্ত কেউ বরাহমিহিরকে অতিক্রম করতে পারেননি।

তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বৃহৎসংহিতা সুপ্রাচীন গর্গসংহিতার

পরিবর্ধন ও পরিমার্জন। বরাহমিহির কেবলমাত্র যে জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন তা নয়; আবহবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা ও স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ সে যুগে কেউ ছিলেন না। তাঁর একমাত্র প্রমাণ বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থখানি। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ মৌলিক। এই গ্রন্থে আধুনিক সিমেণ্ট জাতীয় একটি পদার্থের প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করা হয়েছে। তার নাম ব্রজলেপ। এই ব্রজলেপের দ্বারা তখনকার দিনে বড় বড় পাকাবাড়ি তৈরী হত। বরাহমিহির পূর্ত স্থাপত্য ও আবহবিদ্যায় জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে গেছেন। বরাহমিহিরের জীবনীকার ভট্টপালের (৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) রচনা থেকে জানা যায়, কাল (প্রাণ, ঘটি, মুহূর্ত, পল, বিপল, প্রতিবিপলে বিভজ্য) ও পৃথিবীর আকার বিষয়ে বরাহমিহিরের প্রায় স্বচ্ছ ধারণা ছিল কিন্তু সৌরমণ্ডলের কোন কল্পনা তিনি করেন নি।

তাঁর অপরাপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে বৃহৎবিবাহ-পটল, বৃহৎজাতক ও যোগযাত্রা। এইসব গ্রন্থগুলিতে কেবলমাত্র ফলিত জ্যোতিষের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'যোগযাত্রা' বইখানি যাত্রাকালে শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য রচিত। কৃষি বিষয়ে তাঁর ছোট্ট রচনা বৃক্ষায়ুর্বেদ।

কালিদাস বরাহমিহিরের কাল কবে কেটে গেছে। প্রচলিত কিংবদন্তীগুলি ছাড়া তাঁদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার কোন উপায় নেই। তার জন্য দুঃখ নেই আমাদের। আমরা পেয়েছি তাঁদের প্রতিভার আলো। সেই আলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবাসীকে দেখাচ্ছে পথ, সন্ধান দিচ্ছে নতুন পাথেয়।

বীজগণিতাচার্য ব্রহ্মগুপ্ত

প্রাচীন ভারতে গুর্জর নামে এক ছোট রাজ্য ছিল। এক সময় সেখানে রাজত্ব করতেন ব্যাঘ্রমুখ নামে রাজা। রাজার নামটা এমন ভয়ানক হলে কি হবে, মনটা ছিল ভারী সরল, বয়সেও ছিলেন অত্যন্ত নবীন। প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে কখনো বিবাদ করতেন না, প্রজাদের ছেলের মত ভালবাসতেন, জ্ঞানী-গুণীদের বিশেষ সমাদর করে প্রাসাদে এনে রাখতেন। বড় ভাল রাজা। ভাল হওয়ার কারণও ছিল। তিনি ভাবতেন অবতার শ্রীরামচন্দ্রের ভাই লক্ষ্মণের বংশধর তাঁরা। কিন্তু নিন্দুকেরা বলতো উল্টো কথা। তারা বলে বেড়াত—রাজার পূর্বপুরুষ হরিচন্দ্র এসেছিলেন মধ্য এশিয়া থেকে ভাগ্যান্বেষণে, হূনরা যখন ভারতে আসে ঠিক সেই সময়। আজকের পণ্ডিতেরা বলেন, রাজার কথাও ঠিক নয় আর নিন্দুকদের কথাও ঠিক নয়। গুর্জর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিচন্দ্র ছিলেন রাজপুতানার এক অখ্যাত উপজাতির লোক। যোধপুরের কাছে মন্দর বলে একটা জায়গা ছিল; তাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল গুর্জর দেশ। রাজধানী ছিল ভিল্লমাল। কয়েক শতাব্দী পরে এই রাজ্যের সীমা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। রাজধানীও স্থানান্তরিত হয়েছিল অন্য জায়গায়।

প্রথমে বলেছি রাজ্য ছিল ছোট। তাই রাজার জাঁক-জমক একেবারে নেই। সাতমহলা বাড়ি নেই, হাজার হাজার দাস-দাসী চাকর-চাকরাণীও নেই। রাজঅন্তঃপুরে নীলসায়রের জলের উপর শ্বেত পদ্মও ভাসে না, জল থৈ থৈও করে না। ফুলের বনে ফুলপরীরাও ভিড় করতে আসে না। আসবে কোত্থেকে? ফুলই তো ফোটে না। মরুপ্রায় দেশ কিনা। গরমের সময় মরুভূমির বাতাস এমন ঝাঁ ঝাঁ করে বইতে থাকে যে, তখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়।

সেদিনটাও ছিল প্রচণ্ড গরম। সন্ধ্যে হয়ে এল তবুও গরম বাতাসের বিরাম নেই। ঘরের মধ্যেও থাকা যায় না। রাজা আর কি করেন? একটা ভিজে রুমাল নাকে চেপে ধরে ঠাণ্ডা ঘরে বসেছিলেন। একটু রাত হতেই উঠে গেলেন প্রাসাদের চূড়োয়, শরীরটাকে একটু জুড়িয়ে নিতে। ক্রমে রাত গভীর হলো, রাজা প্রাসাদশীর্ষ থেকে নেমে আসার নামটি পর্যন্ত করছেন না। কেবল তাকিয়ে আছেন দূরে, বহু দূরে কালো কম্বলে ঢাকা আরাবল্লীর চূড়োর দিকে। দুর্গ থেকে ভেসে এল দুপুর রাত অতিক্রান্ত হওয়ার ঘণ্টা ধ্বনি। পাহারাওয়ালা এবং দ্বারীরা যে যেখানে ছিল উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলো তাদের সজাগ উপস্থিতি। এমন সময় রাজার কানে ভেসে এল এক কোলাহলের শব্দ। জ্যোৎস্নালোকে দেখতে পেলেন, একটা ছোট্ট জনতা সিং-দরজা থেকে অল্প দূরে, পরস্পরের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। নেমে এলেন রাজা। সিং-দরজার কাছে আসতে দ্বারী খুলে দিল দ্বার। রাজাকে দেখে একে একে অভিবাদন জানাল সবাই। সর্দার পাহারাওয়ালা একটি যুবককে দেখিয়ে বললো "মহারাজ, এই ব্যক্তি গুপ্তচর। ঐ দূরে গাছের তলায় বসে প্রাসাদের দিকে চেয়ে চেয়ে কাগজে কি সব লিখছিল আর নক্সা করছিল।"

যুবকের আপাদমস্তক ভালভাবে নিরীক্ষণ করলেন রাজা। তারপর বললেন—এই যুবককে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে কড়া নজরে রেখো। কাল সকালে ওর বিচার হবে।

রাতের ভেতরেই কি করে যেন খবরটা ছড়িয়ে পড়লো সারা রাজ্যে। পরদিন সকালে রাজসভায় আর লোক ধরে না। সভাসদরা ভাবছেন, গুপ্তচরের প্রাণদণ্ড না হয়ে যায় না। দর্শকরা ভাবছে, গুপ্তচরকে দেখতে কেমন? একটা জ্যান্ত মানুষের গলাটা কেটে ফেললে কেমন হয়? মন্ত্রী ভাবছেন, ছেলেমানুষ রাজা খেয়ালের বশে গুপ্তচরটাকে ছেড়ে না দেন।

বাহিরে দামামায় ঘা পড়ল। বন্দীরা গান জুড়ে দিল। পাইক ও বরকন্দাজ ছুটাছুটি লাগিয়ে দিল। সেনাপতিমশাই তরবারি

উঁচিয়ে রাজাকে নিয়ে এলেন। রাজার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। যে যেখানে ছিল, সবাই উঠে পড়ে সম্মান জানাল। রাজা বসলেন সিংহাসনে। আদেশ দিলেন, "হাজির কর গুপ্তচরকে।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই কারারক্ষী হাজির করলো এক যুবককে। যুবকের পরনে সাধারণ পোষাক। গলায় উত্তরীয়। অনাহার এবং পরিশ্রমে চক্ষু কোটরাগত তথাপি চোখে তার অসাধারণ দীপ্তি। প্রশস্ত ললাটে রক্তচন্দনের ক্ষীণ রেখা। বিস্মিত হলেন রাজা। কারারক্ষীকে আদেশ করলেন, "খুলে দাও শৃঙ্খল," মুহূর্তে খুলে গেল হাতের দৃঢ় বাঁধন। জিজ্ঞাসা করলেন রাজা—"কি নাম তোমার যুবক? কোথায়ই বা নিবাস?"

নত মস্তকে উত্তর দিল যুবক—"নাম আমার ব্রহ্মগুপ্ত। আপনারই এক দীন প্রজা।"

সভাসদরা চেঁচিয়ে উঠলো—"মিথ্যে কথা; যুবক ভিন্‌দেশী।" কোলাহল থামিয়ে রাজা আবার প্রশ্ন করলেন—"সবাই বলছে তুমি বিদেশী। তুমি যে গুর্জরের অধিবাসী, তার কি কোন প্রমাণ আছে?" যুবক ধীর অথচ নম্রস্বরে উত্তর দিল—"না মহারাজ, এ রাজ্যের কাউকেই আমি চিনিনে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য অতি শৈশবেই গৃহত্যাগ করেছি। পিতামাতাও আজ বেঁচে নেই। খোঁজ করলে হয়ত বুঝতে পারবেন, আমি বিদেশী নই এবং কোন গোপন উদ্দেশ্যও আমার নেই।"

সভাসদরা আবার কোলাহল জুড়ে দিলেন। মন্ত্রীমশাই মাথা নেড়ে, পাকা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"যুবক গুর্জরের অধিবাসী হলেও হতে পারে। তবে গৃহশত্রু বলেই মনে হচ্ছে।" সভাসদরা মন্ত্রীর কথাই মেনে নিলেন এবং যুবকের সাজা হওয়া যে দরকার সে কথাও রাজাকে জানিয়ে দিলেন।

রাজা মৃদু হাসলেন একটু। পাশের এক প্রহরীকে ইঙ্গিত করতেই সে এগিয়ে দিল একখানা কাগজ। রাজা বললেন—"গতকাল রাত্রিতে গাছতলায় বসে তুমি যে নক্সাটা করেছ এটি কিসের বলতে পার? আর এই যে হিজি বিজি লেখা?"

যুবক স্থান কাল পাত্র ভুলে হো হো করে হেসে উঠলো। নগর-কোটাল চোখ পাকিয়ে তরবারি খুলে বললো—"এটি নাট্যশালা নয়—রাজদরবার। ফের যদি অসৌজন্য প্রকাশ কর তাহলে ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেবো।" রাজা নিরস্ত করলেন কোটালকে। যুবক হাত জোড় করে বললো—"মাপ করবেন মহারাজ; আমি শুনেছিলাম মহারাজ জ্ঞানী-গুণীদের আদর করেন। তাই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আপনার কাছে এসেছিলাম আশ্রয়ের খোঁজে। গতকাল প্রাসাদে পৌঁছবার পূর্বেই প্রাসাদের সিং-দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম গাছতলায় আর চাঁদের আলোয় আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের ছবি আঁকছিলাম। কাগজে যে রেখাগুলো দেখছেন এগুলো গ্রহ-নক্ষত্রের রেখাচিত্র। হিজি বিজি লেখা যেগুলো বলছেন এগুলি অঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।"

সভার পণ্ডিতদের কাগজখানা দিয়ে রাজা বললেন—"দেখুন দেখি কিছু বুঝতে পারেন কিনা?"

পণ্ডিতেরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাগজখানাকে দেখলেন। তারপর টিপ টিপ নস্য নিয়ে, টিকি নেড়ে জানালেন—"কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমাদের মনে হচ্ছে এ অঙ্কই নয়।"

রাজা বিরক্ত হলেন। যুবককে বললেন—"তোমাকে আজ থেকে প্রাসাদে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে। আর ঐ যে হিজি বিজি কি সব লিখেছ ঐগুলো বোঝাবার জন্য রচনা করতে হবে একখানা বই। যদি পার রাজধানী ভিল্লমালে তুমি চিরকাল বসবাস করবে। না পার, গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে তোমার হবে প্রাণদণ্ড।"

সভা হল ভঙ্গ। দর্শকরা ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরল। পারিষদরা রাজার খেয়ালীপনায় হলেন বিরক্ত। ব্রহ্মগুপ্ত খুশী হয়ে সেইদিনই মন দিলেন বই লেখায়। অনেকদিন কেটে গেল। ব্রহ্মগুপ্ত একদিন (৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ) রাজাকে উপহার দিলেন ২৪ অধ্যায় বিভক্ত এক মহাগ্রন্থ। নাম হল "ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত"। বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যার এক সুমহান গ্রন্থ। পৈতামহ সিদ্ধান্তের

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ।

অনেকের ধারণা আজকের বীজগণিতের মূলে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দানই সবচেয়ে বেশী। তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ইউরোপীয় বীজগণিতের প্রথম সূত্রপাত আরবী গ্রন্থ। আরবীর মহামনীষী মহম্মদ বেন মুসা আলখাওয়ারিজমী প্রণীত "আলজেবার ওয়াল্ মোকাবিলা" থেকেই অ্যালজাব্রা বা বীজগণিত নামের উদ্ভব। অনেকে বোধহয় জানেন না, আরবী বীজগণিতের মূলে আছে ব্রহ্মগুপ্তের রচনা। বীজগণিতের অংশ কুট্টকাধ্যায়ে তিনিই প্রথম শূন্যকে (০) যথার্থ গাণিতিক মর্যাদা দেন। অবশ্য দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানের জন্যই তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধি। জ্যোতিগণনায় তিনিই সর্ব প্রথম বীজগণিতের সার্থক প্রয়োগ ঘটায়েছিলেন। যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই মহাগ্রন্থখানি। চরকসংহিতা ছাড়া এমন জগৎ জোড়া সম্মান লাভ করার সৌভাগ্য প্রাচীনকালে পৃথিবীর আর কোন পুস্তকের ভাগ্যে ঘটে নি। বর্তমানে গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য এবং এর আরবী সংস্করণও (৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'সিন্দ্-হিন্দ্' নামে প্রকাশিত) লুপ্ত। কিন্তু একাদশ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্তও এর প্রচার ছিল অব্যাহত। আলবেরুণীর রচনা থেকে জানা যায়, তিনি নিজে ছিলেন ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের এক পরম ভক্ত। মনীষী আলবেরুণী একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতে এসেছিলেন সুলতান মামুদের সঙ্গে। ভারতের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের প্রতি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, এদেশের ভাষা আয়ত্ত না করে তিনি পারেন নি।

বাগদাদের খলিফা হারুণ অল রসিদেরও ছিল ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা। ব্রহ্মগুপ্তের রচনাকে আরবীতে অনুবাদ করিয়েছিলেন তিনি। তাঁরই প্রচেষ্টায় ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, হারুণ অল রসিদ (৭৬৩ খ্রীঃ—৮০৯ খ্রীঃ) চরকসংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতারও অনুবাদ করিয়েছিলেন। তাঁর রাজবৈদ্য ছিলেন মঙ্খ নামে এক ভারতীয় চিকিৎসক।

ভাস্করাচার্য ব্রহ্মগুপ্তকে উপাধি দিয়েছেন "গণক চক্রচূড়ামণি"। আনুমানিক ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতার নাম জিষ্ণু। আলবেরুণী বলেছেন ব্রহ্মগুপ্তের জন্মস্থান মূলতান প্রদেশ। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের মতে তিনি গুর্জরের অধিবাসী। তবে ত্রিশ বছর বয়সে গুর্জরের রাজা ব্যাঘ্রমুখের সময়ই যে ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত রচনা করেছিলেন সেকথা তিনি নিজেই উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর জীবিতাবস্থায়ই বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবং মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই বইটি সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। তৎকালীন আরবীয় পণ্ডিতগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্তের বীজগণিতের অংশ এবং ব্রহ্মগুপ্তের রচনাকে ভিত্তি করে আবিষ্কার করেছিলেন আরও বহু তথ্য, যেগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে পড়ে আরও পরিবর্ধিত হয়ে ফিরে এসেছে আমাদের হাতে বীজগণিতরূপে। বহু বিদেশী পণ্ডিত স্বীকার করেন বীজগণিতের স্রষ্টা প্রাচীন ভারতবর্ষ। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্তের চেয়ে বড় বীজগণিতজ্ঞ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। জ্যামিতিতে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল তুলনায় কম। গ্রন্থের পাটিগণিতের অংশে তিনি কুড়িটি বিভিন্ন গাণিতিক অনুষঙ্গের ব্যাখ্যা করেছেন। ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "কারণ খণ্ড খাদ্যক" নামে আর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অন্ধ আর্যভট্ট-বিদ্বেষের জন্য তিনি পরবর্তী কালে নিন্দিত হয়েছেন।

বিজ্ঞানের উন্নতি একদিনে হয় নি। এর পেছনে আছে হাজার হাজার বছরের, হাজার হাজার বিজ্ঞানীর কঠোর তপস্যা। আবার বিজ্ঞানের গোড়ায় রয়েছে গণিত। সেই গণিতেরই স্রষ্টা আমাদের পূর্বপুরুষ।

মহাগণিতজ্ঞ শ্রীধরাচার্য

গঙ্গাবক্ষে ভেসে চলেছে সারি সারি নৌকা, বজরা আর পানসী। মহারাজ প্রথম মহীপালদেব চলেছেন পূর্ববঙ্গে বিদ্রোহ দমন করতে। সঙ্গে রয়েছেন রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্য ও সামন্তগণ। সম্রাট দেবপালের মৃত্যুর' পর থেকে প্রায় দেড়শ' বছর ধরে পালবংশের যে অধঃপতন চলেছে তাকে রোধ করতে সম্রাট মহীপাল বদ্ধপরিকর। নিঃশ্বাস ফেলারও তাঁর অবসর নেই। প্রাসাদেও তিনি বসে থাকেন না। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। কাজও হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় অর্ধেক ভারতভূমি পালসাম্রাজ্যের পদানত। সেদিনও বিজয়-বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন মহীপালদেব। লোকজন, সৈন্যসামন্তদের চিৎকারে গঙ্গাবক্ষ উদ্বেলিত। গঙ্গার উভয় কূলে ছুটে আসছে জনস্রোত। প্রত্যক্ষ করছে সম্রাট মহীপালের বিজয়-বাহিনীকে।

সুসজ্জিত এক বজরার ছাদ থেকে তাকিয়ে দেখছেন মহীপাল আর মৃদু মৃদু হাসছেন। হঠাৎ নজরে পড়লো, গঙ্গার পশ্চিম কূলে এক বৃদ্ধ-বটচ্ছায়ায় আপনমনে কি যেন লিখে চলেছেন এক তরুণ তাপস। এত কোলাহল, এত চিৎকারেও তাঁর মনোযোগ নষ্ট হচ্ছে না। বিস্মিত হলেন সম্রাট। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন যুবকের দিকে। গায়ের রঙ তাঁর তপ্ত কাঞ্চনের মত। মুখমণ্ডল ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু গুম্ফে ভরা। পরনে গৈরিক। স্কন্ধে উত্তরীয়। কে এই তাপস? কৌতূহলী হয়ে বজরা তীরে ভিড়ালেন সম্রাট। অনুচরদের আদেশ করলেন—দেখে এস, কে এই ঋষিকুমার। বলো, সম্রাট মহীপাল তাঁর দর্শনপ্রার্থী। কিন্তু সাবধান, ঋষিকুমারকে যেন বিন্দুমাত্র অপমানিত করা না হয়।

নত মস্তকে সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল অনুচরবৃন্দ। উপস্থিত হল যেখানে সেই ঋষিকুমার আপন মনে লিখে চলেছেন।

সসম্ভ্রমে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো জনৈক অনুচর। কিন্তু নির্বিকার যুবক। টেরই পেলেন না এত লোকের উপস্থিতি। অনুচরেরা মহা বিপদে পড়লো। একজন চিৎকার করে বললো,—"হে তাপস, প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ মহীপালদেব আপনার দর্শনপ্রার্থী, দয়া করে গাত্রোত্থান করুন।"

যুবক তথাপি নিরুত্তর।

মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো তারা। কিন্তু মহারাজের নির্দেশ। বাধ্য হয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হল তাদের। একজন অনুচর তাঁর কানের খুব কাছে মুখ এনে পুনর্বার ঘোষণা করলো মহারাজের আদেশ। তথাপি ধ্যানভঙ্গ হলো না যুবকের। যেন আত্মসমাহিত তিনি। পার্থিব জগৎ থেকে নির্বাসিত অনেক অনেক দূরে। শেষে এক বুদ্ধিমান অনুচর অঙ্গস্পর্শ করে তাঁকে মৃদুভাবে সঞ্চালিত করলেন। এতক্ষণে চোখ তুলে তাকালেন যুবক। ভ্রূকুঞ্চিত করে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আপনারা ?"

—সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর সম্রাট মহীপালদেবের অনুচর আমরা।

মৃদু হাসি ফুটলো যুবকের ওষ্ঠাধরে। সেই হাসিতে শ্রদ্ধা কিংবা ব্যঙ্গ কোন্‌টি মেশান ছিল কিছুই বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করলেন যুবক—কি চান আপনাদের সম্রাট ? আমার মত এক দীন এবং নগণ্য তাঁর কি উপকারে লাগতে পারে ?

যুবকের বিনয়ে সন্তুষ্ট হল অনুচরবর্গ। করজোড়ে বললো—"অদূরে দণ্ডায়মান আমাদের মহান সম্রাট। উৎসুক তিনি আপনার পরিচয়ে।"

এবারেও হাসলেন যুবক। বললেন,—সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে বল, দীন শ্রীধরের পরিচয় দেওয়ার মত কিছুই নেই।

—তথাপি সাক্ষাৎপ্রার্থী তিনি। দয়া করে চলুন ঋষিবর।

হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন যুবক। বললেন—ঋষি আমি নই রাজপুরুষ, আমাকে ও নামে অভিহিত করে ত্রিকালজ্ঞ সেই সব মহাপুরুষদের অবমাননা করবেন না।

গাত্রোত্থান করলেন যুবক। ধীর পায়ে মহারাজের কাছে এগিয়ে গিয়ে ভক্তিভরে অভিবাদন জানিয়ে জোড়হাতে বললেন—আপনার দীন প্রজার প্রতি কি আদেশ মহারাজ?

যুবকের বিনয়ভরা কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হলেন সম্রাট। অচিন রশ্মির মত তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন তিনি। আশ্চর্য হলেন তাঁকে দেখে। চোখে মুখে প্রতিভার ছাপ। হিমাদ্রির মত উচ্চ শির। অন্তরে মহাসমুদ্রের প্রশান্তি। জিজ্ঞাসা করলেন—কে তুমি তাপস? এত তন্ময় হয়ে কি লিখছিলে তুমি?

নত মস্তকে জানালেন যুবক—বলদেব শর্মার পুত্র আমি, শ্রীধর আমার নাম। জননী অচ্ছোকা দেবী। জন্মভূমি রাঢ়ের একটি গ্রাম। গঙ্গার জলস্রোতের মাঝে খুঁজছিলাম আমার পরিচয়।

—তোমার পরিচয়? বিস্মিত মহারাজ প্রশ্ন করলেন।

মৃদু হাসলেন শ্রীধর, বললেন—হ্যাঁ মহারাজ, সমস্ত জীবজগতের পরিচয়।

খুশী হলেন সম্রাট, বললেন—কিন্তু কি যেন লিখছিলে তুমি?

—অঙ্ক কষে হিসাব মেলাচ্ছিলাম।

—হিসাবের কি কোন গরমিল হচ্ছে?

—না, সব মিলে যাচ্ছে।

আনন্দিত সম্রাট বললেন—আজ সময়াভাবে তোমার সঙ্গে বেশীক্ষণ অতিবাহিত করতে না পারায় আমি দুঃখিত তাপস। যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহলে যেও একদিন আমার রাজসভায়। সম্রাট মহীপাল আজ সাদর আনন্ত্রণ জানাচ্ছে তোমাকে।

সম্মতি জানালেন শ্রীধর। হাত জোড় করে বললে—আপনার আমন্ত্রণে দীন আজ কৃতার্থ।

একদিন শুভক্ষণে রাজদরবারে উপস্থিত হলেন শ্রীধর। সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন মহীপাল। অবাক হলেন তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে। সম্রাটের মনে হল যেন এক মহাসমুদ্রের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে। জগতের অগণিত জলধারা এসে মিশেছে এখানে। হারিয়ে

ফেলেন নিজেকে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে প্রাচীন ভারত এক দৃশ্য। সিন্ধু গঙ্গার কূলে কূলে বসে আছেন যত সর্বজ্ঞ ঋষি তাঁদের মুখ-নিঃসৃত অপূর্ব এক মহা সঙ্গীতের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সারা ভারতবর্ষে। গদগদ কণ্ঠে বললেন সম্রাট—ধন্য তুমি তাপস, আর ধন্য আমি। আমার ইচ্ছায় আজ থেকে তোমার স্থান হোক এই রাজদরবারে।

করজোড়ে শ্রীধর বললেন—ক্ষমা করবেন মহারাজ। বনের পাখী আপন মনে গান গায়। তাকে খাঁচায় বন্ধ করলে মাত্র একটি মুখস্থ বুলিই সে আবৃত্তি করে।

হাসলেন সম্রাট। বললেন—বনের পাখীর পক্ষ নিশ্চল করার অভিপ্রায় আমার নেই তাপস।

—তাহলে যেতে দিন আমায় সম্রাট। আপন মনে গান করি।

—তবে তাই হোক। তোমার কলকাকলিতে সচকিত হোক পৃথিবী। জন্মভূমি হোক পবিত্র।

সম্রাটের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন যুবক।

এই যুবকই মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত ও মহাগণিতজ্ঞ শ্রীধরাচার্য। সংক্ষেপে শ্রীধর। ইনিই বিশ্বের প্রথম গণিতজ্ঞ, যিনি পাটীগণিত থেকে বীজগণিতকে পৃথক করেন। তাঁর আবিষ্কৃত দ্বিঘাত সমীকরণের সূত্রটি আজও পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েদের শিখতে হয়। ইনিই মনে হয় প্রথম গণিতজ্ঞ যিনি শূন্য (০) সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন।

আদি যুগে মানুষ সংখ্যা ব্যবহার জানত না। মুদ্রার প্রচলনও ছিল না। মানুষের প্রয়োজন মিটত বিনিময়ের মাধ্যমে। তাছাড়া মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী আজকের মত এত জটিল ছিল না। তাদের প্রয়োজন ছিল সীমিত। তথাপি বিনিময়ের প্রয়োজন হত। ধরা যাক, একজনের হয়ত শস্য আছে বলদ নেই। অপরের বলদ আছে কিন্তু শস্যের তার প্রয়োজন। তখন উভয়ে বিনিময় করে নিত। তখনকার দিনে কোন কিছু হিসাব করতে গেলে মানুষ হাতের আঙ্গুল,

পায়ের আঙ্গুল, গাছের পাতা, পাথরের টুকরো ইত্যাদির সাহায্য নিত। যেমন একজনের হয়ত অনেকগুলো মেষ আছে, তাদের সংখ্যা হাত পায়ের আঙ্গুলে সংকুলান হচ্ছে না, তখন যতটা মেষ ততটা পাথরের টুকরো জমা রাখতো। মানুষ বুদ্ধিমান। অসুবিধা দূর করতে তারা আবিষ্কার করল কতকগুলো প্রতীক, যেগুলোর দ্বারা এক, দুই, তিন···ইত্যাদি সংখ্যাগুলোকে বোঝায়। এই প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময় আবিষ্কৃত হল। তাই মিল থাকলো না কারো সঙ্গে। কিন্তু এবারেও হল গোলমাল, এক থেকে শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি, কত প্রতীক মানুষ মনে রাখতে পারে? পাশ্চাত্য মহা দুর্ভাবনায় পড়লো। হিন্দুরা এক নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলো শূন্য আবিষ্কার করে। তাঁরা প্রথম দেখালেন এক থেকে নয় এই কয়েকটি সংখ্যার প্রতীক হলেই কাজ মিটে যায়। তারপর বসাও শূন্য, যত বড় সংখ্যাই হোক না কেন কিই বা এসে যায়।

শূন্য আবিষ্কার ভারতেরই দান। শূন্য যখন একক থাকে তখন এর কোন মান নেই। কিন্তু কোন সংখ্যার পর বসালেই এর মান হবে অনেক বড়। যে শূন্যের এই যে অদ্ভুত ক্ষমতা তাকে কোন রাশির সঙ্গে যোগ, বিয়োগ, গুণ কিংবা ভাগ করলে সেই রাশির মান কি হবে?

শ্রীধরাচার্যই এ বিষয়ে প্রথম ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেছেন, কোন রাশির সঙ্গে শূন্য যোগ করলে কিংবা বিয়োগ করলে সংখ্যাটির কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু গুণ করলে গুণফল শূন্যই হবে। শ্রীধরাচার্যের এই নিয়ম অঙ্কশাস্ত্রে অদ্যাবধি প্রতিপালিত। অবশ্য ভাগের কথা তিনি কিছু বলে যান নি। তাঁর অনেক পরে মহর্ষি ভাস্করাচার্য বলেছেন কোন রাশিকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে অনন্ত রাশি।

শ্রীধরাচার্যের গণিত গ্রন্থটির নাম "ত্রিশতিকা"। বলা বাহুল্য গ্রন্থটিতে তিনশতটি শ্লোক আছে বলে এইভাবে নামকরণ করা হয়েছে। গ্রন্থটির অপর নাম "গণিতসার"। বীজগণিত ও পাটীগণিতের বহু নিয়ম আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। তন্মধ্যে ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ,

সম্ভূয় সমুত্থান, সুদ নির্ণয়, দ্বিঘাত সমীকরণ, বর্গমূল ও ঘনমূল এবং শূন্য সম্বন্ধে আলোচনাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। পরিমিতিও আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। আর্যভট্ট π (পাই)-র মান চার দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সত্য কিন্তু সংখ্যাটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। কারণ $\frac{২২}{৭}$ অর্থাৎ ২২কে ৭ দ্বারা ভাগ করলে কোনকালেই ভাগশেষ শূন্য হবে না। শ্রীধরাচার্য তাই π-র মান $\sqrt{১০}$ ধরে গেছেন।

শ্রীধরের আবির্ভাব কাল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ। গঙ্গার পশ্চিম তীরে রাঢ়দেশে বর্তমান হুগলী জেলায় এক সম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম বলদেব শর্মা বা বলদেব আচার্য। মাতা অচ্ছোকাদেবী। পিতা বলদেব ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি। দূর দূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে পড়াশুনার জন্য আসতেন। বালক শ্রীধর পিতার কাছেই প্রথম শিক্ষালাভ করেন। পরে কোথায় এবং কিভাবে বিদ্যার্জন করেন সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে তাঁর সময় ভারতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। শ্রীধরাচার্য হয়ত তাদের কোন একটিতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি মহারাজ মহীপালদেবের সমসাময়িক এবং ব্রহ্মগুপ্তের পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মহাবিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য তাঁর গণিতে শ্রীধরের বীজগণিতের বহু নিয়ম গ্রহণ করেছিলেন ; কিন্তু কোথাও তাঁর নামোল্লেখ করেন নি। তবে শ্রীধরের বীজগণিতের কথা ভাস্করাচার্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রীধরের যে বীজগণিতের কথা ভাস্করাচার্য আলোচনা করে গেছেন সে বীজগণিত আজও পাওয়া যায় নি।

শ্রীধরাচার্য কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ছিলেন না, ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ। মহর্ষি গৌতম ও মহর্ষি কণাদ দ্বারা উক্ত ন্যায়সূত্র এবং বাৎস্যায়ন—বাচস্পতি মিশ্র, জয়ন্ত কর প্রভৃতি আচার্য-গণের টীকা ও ভাষ্য প্রাচীন ন্যায় নামে অভিহিত। মধ্যযুগে যে কয়েকজন আচার্য ন্যায়শাস্ত্রকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন শ্রীধর তাঁদের

অন্যতম। শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী মনীষার পরিচায়ক এবং সংস্কৃতচর্চায় বাঙ্গালীরাও যে অনগ্রসর ছিলেন না সে পরিচয়ও বহন করে।

প্রাচীন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে আত্মতত্ত্ব ও জড়তত্ত্ব এই উভয় তত্ত্বই আলোচিত হয়েছে। বলা হয়েছে এই দুই তত্ত্বের জ্ঞানলাভের ফল মোক্ষলাভ। জড়তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে মহর্ষি কণাদ বলেছেন, পদার্থমাত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'কণা' গঠিত। অর্থাৎ পদার্থের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশই হচ্ছে কণা। জন ডালটন যাকে 'পরমাণু' আখ্যা দিয়েছেন। 'কণা' কথাটি মনে হয় 'কণাদের' কাছ থেকে এসেছে। আজকে পরমাণুবিজ্ঞানের অগ্রগতির দিনে ডালটনের পরমাণুবাদের মধ্যে অনেক অসংগতি ধরা পড়লেও পরমাণুবাদের প্রবর্তক হিসাবে জন ডালটনের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু ডালটনের বহু পূর্বে ঐ একই তথ্য ভারত ঘোষণা করেছিল। শুধু তাই নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ন্যায়ও বৈশেষিক্ দর্শনে ভারত চূড়ান্তভাবে উন্নতি লাভ করেছিল। পরে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে নব্যন্যায় নামে ন্যায়শাস্ত্রের আর একটি শাখার উদ্ভব হয়। উদ্ভাবক মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায়। গঙ্গেশের পর বর্ধমান, শ্রীনাথ, পক্ষধর মিশ্র, বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহা মনীষিগণ এই শাখাকে পুষ্ট করেন। নব্যন্যায়ের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে আধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আলোচিত হয়েছে পদার্থতত্ত্ব। পদার্থবিদ্যা বলতে আমরা বর্তমানে যা বুঝি তেমন সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক আলোচনা না হলেও পদার্থের গঠন, ধর্ম প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত ভাবে যা প্রাচীন ভারতবর্ষের পদার্থবিজ্ঞানে উন্নত চিন্তাধারার স্বাক্ষর বহন করে।

দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীধরাচার্যও একাধারে অঙ্কবিজ্ঞানী এবং পদার্থ-বিজ্ঞানী। অনেকের ধারণা শ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ এবং মহাদার্শনিক শ্রীধর ও গণিতাচার্য শ্রীধর একই ব্যক্তি। প্রাচীন লেখকদের বৈশিষ্ট্য ছিল

নিজের বংশ পরিচয় স্বরচিত গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা। শ্রীধর তাঁর ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে সে সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দিয়ে গেছেন। তবে নিতান্তই অল্প। কিন্তু গণিত গ্রন্থে কিছুই উল্লেখ করেননি। হয়ত বাহুল্য মনে করে দ্বিতীয় গ্রন্থে প্রকাশ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। ত্রিশতিকা গ্রন্থে কেবলমাত্র উল্লেখ করেছেন ৯১৩ শকাব্দে তিনি বইটি লিখতে আরম্ভ করেন। ৯১৩ শকাব্দ বা ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দই ত্রিশতিকার রচনাকাল। কবে, কোথায় এবং কত অব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন সে বিষয়ে কিছুই জানা যায় নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, গুপ্তযুগের মত পালযুগও ভারতীয় ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। ভারতীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের বাহিরে বহু দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন অতীশ দীপঙ্করের মত মহা পণ্ডিত, চক্রপাণির মত শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রজ্ঞ, শ্রীধরের মত গণিতাচার্য, মহারাজ দেবপালের মন্ত্রী গর্গ ও দর্ভপাণির মত দার্শনিক ও কবি, রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর মত সুকবি। ইতিহাসের অন্ধকারময় পৃষ্ঠা থেকে এঁদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব নয়। আজ দিন এসেছে এঁদের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করার ; তাহলেই আমরা জানতে পারবো নিজেদের দেশকে এবং চিনতে পারবো নিজেদের।

মহাবিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য

এক ছিলেন জ্যোতিষী ও জ্যোতির্বিদ্। তাঁর ছিল সুন্দর ফুটফুটে এক মেয়ে। মেয়েটি বড় আদরের। এক মুহূর্ত কাজ ছাড়া করতে পারেন না জ্যোতিষী। মেয়ে তো নয়, যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী। এই বয়সে বাবার কাছে বসে বসে বহু বিদ্যাই আয়ত্ত করে নিয়েছে। মাঝে মাঝে জ্যোতিষীও অবাক হয়ে যান মেয়ের ধী-শক্তি দেখে। কত রাজ্য থেকে কত মণিমুক্তো এনে গড়িয়ে দিয়েছেন মেয়ের

অলংকার। পায়ে মল, কানে হীরের দুল, গলায় মুক্তোর মালা ; চুনি-পান্না-হীরে-মাণিক বসানো শিরোভূষণ, পরনে নীল রেশমী শাড়ী ; যেন সাক্ষাৎ দেবী-মূর্তি। যখন ছুটতে ছুটতে এসে বাবার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন এক পরম তৃপ্তিতে ভরে যায় জ্যোতিষীর মন।

মাঝে মাঝে ব্যথাও অনুভব করেন। মেয়েকে তো আর চিরকাল কাছে ধরে রাখা যাবে না ; তাকে একদিন না একদিন তুলে দিতে হবে পরের ঘরে। তখন কি নিয়ে থাকবেন জ্যোতিষী ? মেয়ের আট দশ বছর বয়স হয়ে গেলেও স্নেহের বশে বিয়ে দেননি। না—আর দেরী করা উচিত নয়। মন স্থির করে ফেললেন জ্যোতিষী। বিয়ে দিয়ে মেয়ে জামাইকে কাছে এনেই রাখবেন।

স্বল্পায়াসে একটি সুপাত্রও পাওয়া গেল। খুশী হয়ে জ্যোতিষী মেয়ের জন্মপত্রিকা নিয়ে বসলেন। শুভলগ্নে বিয়েটা সম্পন্ন হলেই তিনি নিশ্চিন্ত। কিন্তু একি !—শিউরে উঠলেন জ্যোতিষী। তাঁর ভুল নয় তো ? একবার নয়, দু'বার নয়, বেশ কয়েকবারই গণনা করলেন। অথচ প্রতি বারেই তাঁর গণনা নির্দেশ করল—মেয়ের কপালে আছে অকাল বৈধব্য।

কপালে করাঘাত করে হায় হায় করে উঠলেন জ্যোতিষী। ছিন্নমূল তরুর মত লুটিয়ে পড়লেন সেইখানে। আর চোখ থেকে নামল শ্রাবণের ধারা। মেয়েটি এতক্ষণ কোথায় যেন খেলা করছিল। বাবার কথা মনে পড়তেই সে ছুটে এল। দেখল তার বাবা মাটিতে পড়ে কাঁদছেন। অবাক হয়ে গেল বালিকা। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে কাছে গিয়ে তার ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরে বললো,—"বাবা তুমি কাঁদছ ?"

বালিকার ব্যথাভরা কণ্ঠস্বর জ্যোতিষীর বুকে তীরের মত বিঁধল। মনে হল যেন সমূহ ব্যথাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে সে পিতাকে শান্ত করতে চাইছে। ততক্ষণে মেয়ের চোখ দু'টোও শুকনো নেই।

আরও অশান্ত হয়ে উঠলো জ্যোতিষীর মন। তারপর এক সময় ফিরে পেলেন তিনি দৃঢ়তা। মেয়েকে কোলে টেনে নিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে

বললেন, "কাঁদিসনে মা, জ্যোতিষসম্রাট ভাস্করাচার্য তার একমাত্র কন্যার ললাট-লিখন খণ্ডন করবেই।" মেয়েটি কি বুঝল সেই-ই জানে। কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল বাবার মুখের দিকে।

জ্যোতিষী আহার নিদ্রা ভুলে মেতে উঠলেন গবেষণায়। রাত দিন ঘরের কোণে পড়ে থাকেন। কত কি আঁক-জোক কষেন। শেষে সন্ধান পেলেন একটি বিশেষ মুহূর্তের। মুহূর্তটি এমনি যে, সে সময়ে বিয়ে হলে কন্যার ভাগ্যে কোনদিনই জুটবে না বৈধব্য যন্ত্রণা। খুশীতে ভরে গেল জ্যোতিষসম্রাট ভাস্করাচার্যের মন।

বিবাহের দিন। বর এসে গেছে। অনেক আগে থেকে জলে ভাসমান এক ফুটো পাত্রের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে বসে আছেন ভাস্করাচার্য। পাত্রের ছিদ্রটি ছিল বিশেষ মাপের। ধীরে ধীরে জল প্রবেশ করে এক সময় যখন পাত্রটি সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়ে যাবে তখনই নির্দেশিত হবে শুভ মুহূর্তটি। সেই মুহূর্তেই সম্পন্ন হবে বিবাহ। তখনকার দিনে ঘড়ি ছিল না বলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ভাস্করাচার্য।

মেয়েটি কাছে পিঠে কোথাও ছিল। বাবার খোঁজে এসে দেখল, এক মজার খেলা খেলছেন তার বাবা। ফুটো পাত্রটিকে ধীরে ধীরে ডুবতে দেখে আনন্দে সে হাততালি দিয়ে উঠলো। সহসা পাত্রটিতে ছিটকে পড়ল তারই শিরোভূষণ থেকে একখণ্ড মুক্তো। রন্ধ্রপথ রুদ্ধ হল : সম্ভব হল না শুভ মুহূর্তটি নির্ণয় করা।

যেন পাথর হয়ে গেলেন ভাস্করাচার্য। তাঁর অতন্দ্র সাধনা, যত্ন, পরিশ্রম সবই এক মুহূর্তে ব্যর্থতার অন্ধকারে ডুবে গেল। হতাশায় ভরে উঠল তাঁর মন। পলকহীন বিবর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। তারপর এক সময় আপন মনে বলে উঠলেন, "বিধিলিপি! তাকে খণ্ডন করার সাধ্য মানুষের নেই। মূর্খ আমি। স্নেহের বশে বৃথাই চেষ্টা করেছিলাম বিধির বিধানকে পাল্টে দিতে।"

তারপর নির্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন হল বিবাহ। যা হবার তাই হল। কিছুদিন পরে সিঁথির সিঁদুর মুছে কন্যা লীলাবতী ফিরে এল

পিতৃগৃহে। এবারে আর কাঁদলেন না জ্যোতিষী। অনেক আগে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। মনটাকেও রেখেছিলেন পাষাণ করে। তাই কেবল একটা অন্তর্ভেদী দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর হৃদয় থেকে। ঠোঁট দু'টো কেঁপে উঠল থর থর করে অব্যক্ত এক বেদনায়।

বড় মনমরা হয়ে পড়লেন ভাস্করাচার্য। ভাল করে তাকাতেই পারেন না মেয়ের মুখের দিকে। মেয়েটিরও সে চঞ্চলতা নেই। হাসতে যেন একেবারেই ভুলে গেছে। কারণে অকারণে বাবার কাছে আর ছুটেও আসে না। জ্যোতিষী ভাবেন, আর নীরবে চোখের জলে ভাসেন। অতীতের সেই কলহাস্যমুখর দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে অনুযোগ করেন, "ফুলের মত সুন্দর এই কচি মেয়েটার কপাল পুড়িয়ে তোমার কি লাভ হল দয়াময়? কিংবা আমারই কপালের দোষ?"

দিন, মাস, বছর গড়িয়ে গেল। মেয়ে কত কাছে থেকে তাঁর পরিচর্যা করে; তবুও ভাস্করাচার্যের মনে হয় উভয়ের মধ্যে যেন এক দুস্তর মহা-সমুদ্রের ব্যবধান। একটা ধূসর জগতের বাসিন্দা তাঁরা। সামনে পেছনে মহা অন্ধকার। নিয়তির বিষ-নিঃশ্বাসে সব অন্ধকার হয়ে গেছে। বেদনায় ভারাক্রান্ত জ্যোতিষী ভাস্করাচার্য ভাবেন কন্যার ভবিতব্য। তাঁর মৃত্যুর পর কে দেখবে তাঁর মেয়েকে? কি নিয়ে কাটাবে সে বাকী জীবন?

একদিন গোধূলি-বেলায় মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে এইসব কথাই ভাবছিলেন ভাস্কর। সূর্যের শেষ রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে বৃক্ষশীর্ষে। কলতানে চারদিক সচকিত করে বিহঙ্গের দল ফিরে চলেছে আপন কুলায়। ভাস্করাচার্যের হৃদয়েও বুঝি ধ্বনিত হচ্ছিল তাঁরই অন্তিম জীবনের অশ্রুত পদধ্বনি। কিন্তু কন্যা লীলাবতী?

ঠিক সেই সময়েই লীলাবতী এসে বসল পিতার কাছে। ধূসর চোখে সেও তাকালো নীল আকাশের দিকে। পিতার সস্নেহ কণ্ঠে বেজে উঠলো আহ্বান, "মা লীলা!"

—কি বাবা ?

একটু নীরব থেকে বললেন ভাস্কর, "তুমি তো জানো মা, অলীক এই সংসারে একমাত্র জ্ঞানই সত্য।"

—জানি পিতা।

—আমার ইচ্ছা, তুমি জ্ঞানব্রতী হও কন্যা। সংসারে জ্ঞানের দীপিকা জ্বেলে আলো দেখাও।

—আমি কি তা পারবো ?

—পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই মা। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে।

—কিন্তু কে দেখাবে সেই পথ ?

স্মিতহাস্যে ভাস্করাচার্য বললেন—"আমিই দেখাব মা !" লীলাবতী পিতার দিকে একবার তাকাল। তারপর চোখ দুটি নামিয়ে নিয়ে পিতাকে প্রণাম করে বললো, "তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা পিতা। আশীর্বাদ কর, দুস্তর জ্ঞানসমুদ্রে বিচরণ করার মত শক্তি ও সাহস যেন আমার হয়।"

এক গুরুভার প্রস্তরখণ্ড নেমে গেল ভাস্কারাচার্যের বুক থেকে। রচনা করলেন মহাগ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'—সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রের সার। আনুমানিক ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে নিউটনের আবিষ্কারের প্রায় পাঁচশ' বছর আগে রচিত হয়েছিল এই গ্রন্থ। বর্তমান কালের এক পরম বিস্ময়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্তও কোন জাতির জানা ছিল না যে পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসমান এবং তার কোন আধার নেই। সব দেশের মানুষের ধারণা ছিল পৃথিবী কোন না কোন একটা আধারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুদের ধারণা ছিল আটটি বিশালকায় দিগ্‌গজ দাঁত দিয়ে ধরে আছে পৃথিবীকে। আবার সেই দিগ্‌গজগুলোও দাঁড়িয়ে আছে মহাসমুদ্রে ভাসমান এক বিশালকায় কূর্মের পিঠে। আবার কোন কোন শাস্ত্রকার বলেছেন সহস্র ফণাযুক্ত অনন্তনাগ তাঁর একটি মাত্র ফণায় ধরে আছেন পৃথিবীকে। মাঝে মাঝে এক ফণা

থেকে অন্য ফণায় স্থাপন করেন পৃথিবীকে। তাইতো দুলে ওঠে পৃথিবী। আমরা বলি ভূমিকম্প।

ভাস্করাচার্যই প্রথম জ্যোতিবিদ এবং গণিতজ্ঞ যিনি এই সব ধারণার মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করেন তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন—এই সব কষ্ট-কল্পনার প্রয়োজন কি? মহাসমুদ্রে ভাসমান-কল্পনা না করে ধরে নাও না কেন পৃথিবীর কোন আধার নেই।* এটি চ্যাপ্টা নয়, গোলাকার। এর চতুর্দিকে রয়েছে আকাশ। বৃন্তচ্যুত ফলের মত টুপ করে খসে পড়তে পারে না। পড়লে যাবেই বা কোথায়?

'সিদ্ধান্ত শিরোমণি'তে মহাকর্ষের কথা রয়েছে—বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছেন মহাত্মা নিউটন। তবে একথা সত্য যে, ভাস্করাচার্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করেননি। তাঁর কল্পনা ছিল ভূকেন্দ্রিক।

আনুমানিক ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বীজ্জলবীড় গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মহেশ দৈবজ্ঞ ও গণিতজ্ঞ। শুধু পিতা বা কন্যা নন, ভাস্করাচার্যের পুত্র লক্ষ্মীন্দর ও পৌত্র গঙ্গাদেবও গণিতজ্ঞ রূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি অমর হয়ে আছেন তাঁর 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থটির জন্য। গ্রন্থখানি সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করলে তাঁর বিরাট প্রতিভার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

সিদ্ধান্ত শিরোমণি চারখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটির নাম 'লীলাবতী'। এই অংশে আলোচিত হয়েছে পাটীগণিত ও পরিমিতি। ২৭৮টি শ্লোকে গাঁথা এই অংশ উপপাদ্য, দ্বিঘাত সমীকরণ, সমকোণী ত্রিভুজ এবং বর্গক্ষেত্রের অসংখ্য সমস্যা ও সমাধানে পূর্ণ। শোনা যায়, এটি তাঁর বিদুষী কন্যা লীলাবতীকে উৎসর্গ করে গেছেন ভাস্করাচার্য। কেউ কেউ বলেন এটি লীলাবতীর নিজস্ব রচনা। আবার কেউ কেউ

---

* নান্যা ধারঃ স্ব শক্তেব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।

—গোলাধ্যায়ের তৃতীয় অধ্যায়।

এমন মতও পোষণ করে থাকেন যে, পিতা পুত্রী উভয়েরই রচনা এটি। নানা মুনির নানা মত। শ্লোকগুলির কোন কোনটিতে 'বালে,' 'প্রিয়ে' ইত্যাদি সম্বোধন আছে। তাই ভিন্ন মতাবলম্বীদের ধারণা এটি ভাস্করের নিজের রচনা। ভাবভোলা বিজ্ঞানী লীলাবতীর শ্লোকে স্বয়ং সরস্বতীকে সম্বোধন করেছেন কখনও প্রিয়তমা কন্যা রূপে কখনও আপন মানসপ্রিয়া রূপে। সে যাই হোক, আজও পর্যন্ত দেশে বিদেশে বহু অঙ্ক লীলাবতীর নামে প্রচলিত।

সিদ্ধান্ত শিরোমণির দ্বিতীয় খণ্ড বীজগণিত। সমীকরণ ও দ্বিঘাত সমীকরণের তত্ত্ব ছাড়াও ২১৩টি শ্লোকের এই খণ্ডে ধনাত্মক / ঋণাত্মক রাশি / সংখ্যা বিষয়ে বহু প্রসঙ্গ বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই তত্ত্বগুলির আবিষ্কর্তা তিনি একা নন। তাঁর বহু পূর্বে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও শ্রীধরাচার্যের আবিষ্কারকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এই অংশটি।

শেষ দু'টি খণ্ড গ্রন্থ 'গ্রহগণিতাধ্যায়' ও 'গোলাধ্যায়' তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল। তৃতীয় খণ্ডটির প্রাথমিক ভিত্তি অবশ্য সুপ্রাচীন 'সূর্য-সিদ্ধান্ত' মতবাদ। দু'টি খণ্ডেই জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয় এবং পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ।

কিংবদন্তী এই যে, একদিন মহামতি নিউটন বাগানে বসেছিলেন। এমন সময় একটি আপেল গাছ থেকে খসে পড়ল মাটিতে। নিউটনের ধারণা হল বৃন্তচ্যুত এই ফলটি মাটিতে না পড়ে উপরে উঠে যেতে পারত কিংবা সেই গাছের ডালে স্থির ভাবে ঝুলে থাকতে পারত। তাই তিনি মনে মনে ঠিক করলেন, পৃথিবীর এমন এক শক্তি আছে যার বলে তার উপরিভাগের সমূহ পদার্থকে নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। যদি কোন বস্তুকে সজোরে উপরে উৎক্ষিপ্ত করা হয় তা'হলে সেটিও এক সময় পৃথিবীর টানে ফিরে আসবে পৃথিবীর বুকে। এই যে টান যা পৃথিবী তার উপরিভাগের সমস্ত জিনিষকে আকর্ষণ করে তাকেই বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। তবে আজকের দিনে

বিজ্ঞান জানতে পেরেছে যে, কোন বস্তুকে সেকেণ্ডে সাত মাইল বা তারও বেশী বেগে উপরে উৎক্ষিপ্ত করলে সেটি আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে না। অর্থাৎ এই বেগ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাহিরে—যাকে বলা হয় পৃথিবীর প্রস্থান বেগ। আজকের বিজ্ঞান জগতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী। এই মহৎ আবিষ্কারের আবিষ্কর্তা নিউটনের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু নিউটনের আবিষ্কারের পাঁচশ বছর পূর্বে ভাস্করাচার্য একই মত পোষণ করে গেলেও এত বড় একটি আবিষ্কারের জন্য ভারত গর্ব বোধ করতে পারল না। এর চেয়ে বেশী বেদনাদায়ক আর কি হতে পারে!

শুধু তাই নয়—যে পদ্ধতিতে ভাস্করাচার্য চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয় করে গেছেন, পাঁচশ বছর পরে সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন নিউটন ও লাইব্‌নিট্‌স্। পৃথিবী যে গোলাকার তারও প্রমাণ দিয়েছেন ভাস্কর। অথচ সবাই দেখে পৃথিবী সমতল। তার উত্তরে তিনি ভারী সুন্দর একটি যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বৃহত্তম একটি বৃত্তের পরিধির ক্ষুদ্রাংশকে পরীক্ষা করলে আমাদের যেমন সমান মনে হয় তেমনি বৃহৎ পৃথিবীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র মানুষ এককালে যতটুকু অংশ দেখে ততটুকুকে সমান মনে করে।*

আরও বিস্ময়ের কথা, আধুনিক গণিতশাস্ত্রের যে কলনবিদ্যা বা ক্যালকুলাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তরের সূচনা করেছে, সেই কলনবিদ্যারও প্রয়োগ রয়েছে ভাস্করের গোলাধ্যায় খণ্ডে। চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন অন্তর কলন বা

* সমো যতঃ স্যাৎ পরিধে শতাংশ
পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎ পৃষ্ঠ গতস্য কৃৎস্না
সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা॥

ডিফারেনশিয়েল ক্যালকুলাস এবং বর্তুলের ঘনফল নির্ণয় করতে ব্যবহার করেছেন সমাকলন বা ইন্টিগ্র্যাল্ ক্যালকুলাস। অথচ পাশ্চাত্যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নিউটন ও লাইব্‌নিট্‌স্ কর্তৃক এটি আবিষ্কৃত।

অবশ্য কেউ যেন মনে না করেন, এখানে মহাবিজ্ঞানী নিউটন ও অমিত প্রতিভাধর লাইব্‌নিট্‌স্-এর অবমাননা করা হচ্ছে; কিংবা তাঁরা ভাস্করের পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। ভাস্করাচার্যের রচনা যদিও অনুবাদের মাধ্যমে বহুদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল তথাপি একথা সত্য যে, ভাস্করাচার্যের লেখার সঙ্গে নিউটনের কোনদিনই পরিচয় ঘটেনি। নিউটন ছিলেন দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য।

আর লাইব্‌নিট্‌স্, যাঁর সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, আইন ও গণিতে ছিল অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, একাধিক বিষয়ে যাঁর আছে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ, সেই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লাইবনিট্‌স্ও জীবদ্দশায় কলনবিদ্যা আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করতে পারেননি; যেহেতু একই সময়ে নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরও জীবনটা ছিল দুঃখে পরিপূর্ণ। ছ'বছর বয়সে পিতাকে হারিয়েছিলেন। মধ্য বয়সে হারিয়েছিলেন প্রিয়তমা পত্নীকে। শেষ জীবনটা অতিবাহিত করে-ছিলেন, দুঃখে, দারিদ্র্যে ও লাঞ্ছনায়।

মধ্যযুগে গণিত ও জ্যোতিষ শাখার উৎকর্ষ প্রসারের জন্য ভাস্করা-চার্যের নাম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল গণিতজ্ঞ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। দেশ বিদেশের সব পণ্ডিত ব্যক্তিই এক বাক্যে স্বীকার করেন ভাস্করের সমসাময়িক এত বড় গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' এককালে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার অনূদিত হয়েছিল। সমূহ গ্রন্থখানি একই সঙ্গে কেউ অনুবাদ করতে পারেননি; এক এক সময় এক একটি খণ্ড অনূদিত হয়েছে মাত্র। লীলাবতী-অংশটি সম্রাট আকবরকে এতখানি আকৃষ্ট করেছিল যে তিনি এটিকে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করতে নির্দেশ

দিয়েছিলেন। ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আবুল ফজল এটির ফার্সী অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। পরে ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আতাউল রৌশদী বীজগণিত অংশটি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন।

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে সিদ্ধান্ত শিরোমণি মধ্যযুগের এক বিস্ময়কর মূল্যবান গ্রন্থ। কোন রাশিকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে অসীম, গ্রন্থে তাঁর এই উল্লেখ অসাধারণ গণিত প্রতিভার পরিচয় বহন করে। সমস্যা ও সমাধানে আঙ্কিক মুদ্রা ও গাণিতিক প্রতীক প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। এই গ্রন্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক করুণ কাহিনী। যদি কন্যা লীলাবতী বিধবা না হতেন তা'হলে হয়ত ভাস্করাচার্যের মত এত বড় এক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেতো। ভাস্করাচার্যের মত বহু প্রতিভাধর লোকচক্ষুর অন্তরালে সারাজীবন কেবল সাধনাই করে গেছেন। নামের কথা তাঁরা কোনদিনই চিন্তা করেননি। এই হল আমাদের ভারতবর্ষের ঐতিহ্য। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বৈজ্ঞানিক-জ্যোতিষের বীজ বপন করেছিলেন মহর্ষি আর্যভট্ট। পরবর্তীকালে বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মুঞ্জাল প্রভৃতি জ্যোতির্বিজ্ঞানী জলসিঞ্চন করেছিলেন এতে, আর ভাস্করাচার্য গড়ে তুলেছিলেন বনস্পতি রূপে। ১১৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নতুন একটি গ্রন্থ কারণকৌতূহল রচনা করেন। ভাস্করাচার্যের পরই গণিত ও জ্যোতিষের গবেষণা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। আমরা ভারতবাসী, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের দানকে অবহেলা করেছি। বন্ধ করে দিয়েছি অনুশীলন। তাই বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় আবিষ্কারকের গৌরব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরাই অর্জন করেছেন।

নাগার্জুন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভারী সুন্দর একটি গল্প বলতেন। ছোট্ট পাহাড়ী নদী। কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ করে দুষ্টু এক মেয়ের মত ছুটে চলেছে নিজের খেয়ালে। নদীর একপাশে পাহাড়, আর এক পাশে বিরাট তৃণভূমি। সেই তৃণভূমিতে মেষপালক রোজ মেষ চরাতে আসে। একদিন এক ক্ষুধার্ত সিংহী পাহাড়ের গুহা থেকে বেরিয়ে এল নদীর ধারে। দেখতে পেলো হৃষ্টপুষ্ট মেষগুলোকে। লোভে তার জিভ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগলো। মনে মনে বললো,—"যেমন করে হোক্ একটা মেষ আমাকে পেতেই হবে।" একটু দাঁড়াল সে। তারপর ভীষণ এক গর্জন করে লাফ দিয়ে পড়লো নদীর অপর পারে। কিন্তু সে ছিল আসন্নপ্রসবা। নদী ডিঙ্গিয়ে এল ঠিকই কিন্তু ধাক্কা সামলাতে পারল না। একটা বাচ্চা প্রসব করে সেই যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আর উঠল না। সদ্যজাত মাতৃহারা সিংহশিশুটিকে দেখে মেষপালকের অত্যন্ত দয়া হল। তারপর শিশুটিকে কোলে করে ফিরে এল বাড়িতে।

দিন যায়। মেষপালে থেকে সিংহশিশুটিও বড় হয়। মেষের মত সে ঘাস খায়, মেষের সঙ্গে খেলা করে, মেষের মতই বন্যপশুকে ভয় পায়। একদিন দৈবক্রমে এক প্রকাণ্ড সিংহ নদীতে এল জল খেতে। দেখল এই অদ্ভুত ঘটনা। রাগে তার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল। তারপর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ দিয়ে পড়লো মেষপালকের মধ্যে। কিন্তু সে একটিও মেষ ধরল না। ধরে নিয়ে গেল সেই সিংহশিশুটিকে। শিশুটি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। সিংহ গর্জন করে বলল,—"হতভাগা, তুই সিংহ হয়ে মেষপালে দিন কাটাস্?" সিংহশিশুটি কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল ভয়ে। সিংহ বলল,—"বিশ্বাস হচ্ছে না,

চল ঐ নদীর ধারে।" জলের ধারে পাশাপাশি দাঁড়াল দু'জনে। প্রতিবিম্বকে দেখিয়ে সিংহ বলল,—"ঐ দেখ্ হতভাগা, তুইও আমার মত একটা সিংহ, নীচ মেষ ন'স্।" শিশুটি অবাক্ হয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব দেখল, তবুও ভয় কাটে না। সিংহ বুঝতে পেরে ছুটে গিয়ে নিয়ে এল এক গাদা মাংস। সেগুলো তার মুখের কাছে ফেলে দিয়ে বলল,—"খেয়ে দেখ্ ঘাসের চেয়ে কত সুন্দর।"

সিংহশিশুটি মাংসগুলোকে একে একে মুখে পুরতে লাগল। সত্যই তো অদ্ভুত স্বাদ! এবারে তার বিশ্বাস হল যে সে মেষ নয়, সিংহ। ধীরে ধীরে তার পরিবর্তন দেখা দিল। হঠাৎ ভীষণ জোরে গর্জন করে উঠল সে। সেই গর্জন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে ছড়িয়ে পড়ল সারা বনভূমি ও তৃণভূমিতে। ভয়ে কেঁপে উঠলো বনের পশু। ওপারের মেষপাল।

ভারতীয় শিশুরা শ্রীরামকৃষ্ণের সিংহশিশু। পুরাতন ইতিহাসের দর্পণমুকুরে একটিবার যদি নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে তাহলে সঠিক ভাবে চিনে নিতে পারবে।

পাশ্চাত্যের মতে, বিজ্ঞানে ভারতীয়দের দান অকিঞ্চিৎকর। ভারতে কোনকালে বিজ্ঞানচর্চা ছিল না আজও ভালভাবে নেই। বিশ্বের কাছে ভারত তাই অবহেলিত। কিন্তু পাশ্চাত্যের ধারণা আদৌ ঠিক নয়। এমন একদিন ছিল যেদিন বিজ্ঞানের একমাত্র ধারক ও বাহক ছিল এই ভারতবর্ষ। তাহলে বর্তমানে এমন দৈন্য কেন? অবশ্য এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। তবে সবচেয়ে বড় কারণ মনে হয়, সুজলা সুফলা এই সোনার দেশটার প্রতি পাশ্চাত্যের নিদারুণ লোভ। এখনও সে লোভ প্রবল। তাই যুগ যুগ ধরে সম্পদের প্রতি তীব্র আকর্ষণে জাতির পর জাতি এসে হানা দিয়েছে ভারতের দ্বারে। লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে সমূহ সম্পদ, নিগৃহীত হয়েছে ভারতের তাবৎ মানুষ। ধ্বংস হয়েছে শিক্ষা ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠান। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার নিক্ষিপ্ত হয়েছে অগ্নিকুণ্ডে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলেছিল এই পৈশাচিকতা। জাতীয় জীবনের নিরাপত্তা

হয়েছে বিপ্লিত। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ।

খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব থেকেই এখানে প্রচলিত ছিল উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও প্রাচীন ভারতে কম ছিল না। আজকের দিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বহু বিষয় তখনও পড়ান হত। কেবলমাত্র যন্ত্র ও কারিগরি বিদ্যা তখন পড়ান হত কিনা সঠিকভাবে জানা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় জড়-বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত না ঠিকই, তবে প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাণগুলিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যন্ত্র, কারিগরি রসায়নবিদ্যায় ভারত পিছিয়ে ছিল না। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কুমার ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করতেন। রাবণের পুষ্পক রথ পঞ্চবটী বন থেকে সীতাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সুদূর সিংহলে। কত সময় লেগেছিল তার উল্লেখ অবশ্য নেই। তবে ব্রহ্মার বিমান মুহূর্তে শতেক যোজন অতিক্রম করতো। এগুলি কি নিছক কল্পনা?

কেউ কেউ বলবেন, আদি যুগ থেকে মানুষ হিংসা করে আসছে পাখিকে এবং তার পক্ষ-সঞ্চালনের অপূর্ব কৌশলকে। নীল আকাশে গা ভাসিয়ে দিয়ে তারা যখন আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উড়ে যেত তখন মানুষের মনে সৃষ্টি হত রোমাঞ্চ। কল্পনার রঙিন তুলি দিয়ে আঁকতো কত সম্ভব অসম্ভব কাহিনী। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে রাজকুমার যেত পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে। নীল পরীরা বাতাসের মত হাল্কা ডানা মেলে ভীড় করতো ফুলের বনে। রাবণের পুষ্পক রথ, ব্রহ্মার বিমান সবই কল্পনা। অনেকে হয়ত আরও বলতে পারেন, শুধুমাত্র ভারতীয় মহাকাব্যগুলিতে নয়, পৃথিবীর সব দেশের মহাকাব্যগুলিতেও একই কল্পনা।

তাহলে মহাকবিরা কি কেবল অসম্ভব কাহিনীর জাল বুনে পাঠকের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করতেন? এমন কি হতে পারে না, সেই প্রাচীন কালে মানুষ আকাশযান নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছিল? কিন্তু আমরা যখন সে কৌশল তাঁদের কাছ থেকে শিখে নিতে পারি নি এবং তাঁরাও যখন ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নির্মাণ পদ্ধতি-

লিখে রেখে যান নি তখন বাধ্য হয়েই অবিশ্বাসীদের মতবাদের বিরুদ্ধে মৌন থাকতে হয়।

কিন্তু সেই যে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় শুনিয়েছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা, সেও কি ছিল নিছক কল্পনা? কোথায় কুরুক্ষেত্র আর কোথায়ই বা কৌরব রাজভবন! ঘরের মধ্যে বসে থেকেও সঞ্জয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতিটি দৃশ্য। এ সব কি যন্ত্র ছাড়া সম্ভব হয়েছিল? যদি এটিও কল্পনা হয়, তাহলে এ কল্পনার কি কোন গুরুত্ব নেই? সুপ্রাচীনকালে যিনি এমন কল্পনা করতে পারেন, তিনি তো সেরা বিজ্ঞানী। ইউরোপের রেনাসাঁস যুগের বিখ্যাত চিত্রকর 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি'কে সবাই বিজ্ঞানী আখ্যা দিয়ে থাকেন কারণ তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে বাস্তবতা অনেকে লক্ষ্য করে থাকেন এবং সে যুগে তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে অনেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যেমন তিনি আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা করেছিলেন পাখির মত ডানা জুড়ে দিয়ে। তাঁর এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল অক্লান্ত প্রয়াস। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যন্ত্রবিহীন পাখা তৈরি করে উড়তে চেষ্টা করলেন 'জোভান্নি বাত্তিস্তা দান্তি'। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাখায় যন্ত্রপাতি সংযোগ করে উড়তে গিয়ে প্রাণ হারালেন, অটোলিলিয়েন্থাল।' শেষে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অটোলিলিয়েন্থালকে অনুসরণ করে জয়যুক্ত হলেন 'অরভিল রাইট' ও 'উইলবার রাইট'। লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মত ব্যাসদেব যদি কল্পনাই করে থাকেন তাহলে সে যুগে কারো মনে কি কোন রেখাপাত করে নি?

এবার আসা যাক তখনকার দিনের মারণাস্ত্রের কথায়। লঙ্কা যুদ্ধে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু বাণের কথা দু'টি মহাকাব্যেই বর্ণিত হয়েছে। এগুলি কি আজকের দিনের রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্রের পূর্বপুরুষ নয়? সেই সব অস্ত্র নির্মাণের কৌশল যেহেতু তাঁরা আমাদের জন্য লিখে রেখে যান নি, তাই বলে এগুলোকেও কি ধরে নেব মহাকবির কল্পনা-প্রসূত?

আজকের দিনে আমরা যাকে রকেট বলি, তার ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের। ভারত ছাড়াও বহু প্রাচীন সভ্যদেশের সাহিত্যে এর পরিচয় মেলে। অনেকে অনুমান করেন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চীনদেশে এর ব্যবহার ছিল। একাদশ শতাব্দীর চৈনিক লেখক 'মু চিং সুং' এক রকম অগ্নিবাণের উল্লেখ করেছেন ; যাকে নিক্ষেপ করার জন্য ধনুকের প্রয়োজন হত না। কেবলমাত্র বারুদকক্ষে অগ্নি সংযোগ করতে হতো। আমাদের মহাকাব্য ও পুরাণগুলোতে অগ্নিবাণের উল্লেখ বহু জায়গায় রয়েছে। সেগুলি নিশ্চিত রকেট বা হাউই জাতীয় ছিল। মনে হয় সব দেশেই এর অনুশীলন চলেছিল যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে। ইতিহাস বলে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মঙ্গোলদের চীনারা প্রতিহত করেছিলেন ক্ষেপণাস্ত্র বা রকেট দিয়ে। মঙ্গোলদের নেতা ছিলেন দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী বীর চেঙ্গিস্ খাঁর পুত্র 'ওগোদাদ খাঁ'।

আরও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে 'ওয়ানহু' নামে জনৈক চৈনিক রাজপুরুষ রকেটের সাহায্যে আকাশে বিহার করার মানসে ৪৭টি রকেটের মাথায় স্থাপিত বিরাট দুটি ঘুড়ির উপর চড়ে রকেটে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছিলেন কিনা জানা যায় নি ; তবে অল্প সময়ের মধ্যে ধোঁয়ার আড়ালে যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, সে বিষয়ে সবারই একমত।

এইসব তথ্য থেকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মনে করেন রকেটচর্চা চীনাদের কাছ থেকে কালক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল সুদূর ইটালি, ইংলণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশে। কিন্তু রকেট নির্মাণ পদ্ধতি প্রথমে ভারতে যে উদ্ভূত হয়েছিল সে কথা তাঁরা মানতে রাজী নন। হাজার হাজার বছর পরে পাশ্চাত্যে 'রোজার বেকন'ই রকেট যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভারতে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে এর ব্যবহার সুপ্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল এমনকি ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিক পর্যন্তও প্রচলিত ছিল। শোনা যায়, মহীশূরের বীর কেশরী হায়দর আলি প্রথম মহীশূর যুদ্ধে ইংরাজদের পর্যুদস্ত করেছিলেন রকেটের সাহায্য নিয়ে। তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপুও

শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে পিতার পথকে অনুসরণ করেছিলেন।

রকেট তথা অগ্নিবাণের সত্যতা যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে অন্যান্যগুলিই বা অস্বীকার করি কি করে? বীরশ্রেষ্ঠ কুমার ইন্দ্রজিৎ হয়ত ওয়ানহুর মত রকেটের সাহায্যে আকাশে উড়তে পারতেন এবং অবতরণের কৌশলও তাঁর জানা ছিল; যা ভগবান, শ্রীরামচন্দ্র জানতেন না। মহর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে চালান দিতে গিয়ে অসুবিধায় পড়েছিলেন। তিনি যে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন সে যজ্ঞটি কি রকেট উৎক্ষেপণাগার? যজ্ঞের দ্বারাই হোক বা বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট রকেট দ্বারাই হোক ত্রিশঙ্কু আকাশে উঠতে উঠতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেলেন। উপরে উঠতেও পারলেন না, পৃথিবীতে ফিরে আসতেও পারলেন না। বিজ্ঞানে চূড়ান্ত উন্নতির দিনে আজ আমাদের ভাবতে ইচ্ছা হয়, মহাকাশের সেই বিশেষ জায়গাটির কথা কি ভারতীয় মনীষিগণ বুঝতে পেরেছিলেন, যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষমতা একেবারেই শূন্য?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সমালোচকগণ ভাবেন এ কেবল কল্পনা কিংবা অন্য দেশের কাছ থেকে ধার করা। এমন কি উন্নততর হিন্দু জ্যোতিষের নাম করলেও তাঁরা নাসিকা কুঞ্চন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অনেক উক্তি করেছেন, যা পাঠ করলে ভারতবাসী মাত্রেরই আত্মসম্মানে ঘা দেয়। 'বেরীসাহেব' বলেছেন—'হিন্দু জ্যোতিষ' বিজ্ঞান হিসাবে বেশী দূর এগুতে পারে নি। যে দু'একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে তা ভুল ভ্রান্তিতে ভরা; গ্রীকদের কাছ থেকে না বুঝে গ্রহণ করার ফল। 'বেণ্টলী সাহেব' পরিষ্কার বলেছেন, এগুলি ভারতীয় সাহিত্যে 'জালিয়াতি' (forgeries)। এত বড় সুবৃহৎ যে 'এনসাইক্লোপিডিয়াব্রিটানিকা' তাতেও হিন্দু জ্যোতিষের নামগন্ধ নেই। প্রবন্ধকার যাঁরা, তাঁরা ধরে নিয়েছেন প্রাচীন জ্যোতিষটা বেবিলনবাসী ও গ্রীকদের একচেটিয়া ছিল না বুঝে একটি জাতিকে কটাক্ষ করা কিংবা তার মর্মে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করা কি পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক?

প্রাচীনকালের শাস্ত্র আলোচনা করলে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা যায়, কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মগুলোই লিপিবদ্ধ হয়েছে। আবার এমনও দেখা যায় বেশ বড় বড় বৈজ্ঞানিক-গণনার নিয়মাবলী শ্লোকাকারে গ্রথিত হয়েছে অথচ বিচার-বিশ্লেষণের নিদর্শন নেই। বোধহয় এইজন্যই বেরী, বেণ্টলী কিংবা তাদের সমধর্মী লেখকদের ধারণা, বৈজ্ঞানিকদের তথ্যগুলি পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার করা। কিন্তু ভারতীয় মনীষিগণ মনে করেন, পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌখিক প্রসারের প্রচলন ছিল। বিজ্ঞানের বিষয়গুলি যখন অধ্যাপক শিষ্যদের বুঝিয়ে দিতেন তখন নিয়মটি কেবল শ্লোকের আকারে গ্রথিত করে দিতেন। শিষ্য শ্লোকটি মুখস্থ রাখতেন আর বিচার-বিশ্লেষণ অধ্যাপকের কাছ থেকে বুঝে নিতেন। বিভিন্ন গুরুর কাছ থেকে যখন প্রচুর শ্লোক আসতে আরম্ভ করলো তখন সবগুলি মনে রাখা সম্ভব হল না; শিষ্যগণ তালপত্র অথবা ভূর্জপত্রে সেগুলি লিপিবদ্ধ করলেন। পরে রাজনৈতিক কারণেই হোক কিংবা বিলাসিতার জন্যই হোক ভারতীয় বংশধররা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা একেবারেই ছেড়ে দিল। বিচার-বিশ্লেষণ হল লুপ্ত। কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে গেল কেবল শ্লোকগুলো।

এখন প্রাচীন পুঁথিপত্রের কথা ছেড়ে দিয়ে কোথাও কোন নিদর্শন আজও টিকে আছে কিনা দেখা যাক। কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে কোন যন্ত্র বা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল টিকে থাকতে পারে না। তবে নিদর্শন যে একেবারে নেই এ কথাও ঠিক নয়। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় যে প্রাক্ বৈদিক যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতেও দেখা গেছে বিজ্ঞানের দু'একটি শাখায় সে যুগেও ভারত উন্নতি লাভ করেছিল। বিশেষতঃ ধাতুবিদ্যা ও স্থাপত্য শিল্পে। সোনা, রূপা ও তামার ব্যবহার তাদের জানা ছিল; হয়ত নিষ্কাশন পদ্ধতিও জানা ছিল।

বৈদিকযুগেও ভারত ধাতুবিদ্যা আয়ত্ত করেছিল। মধ্যযুগের উৎকর্ষতা সর্বজন স্বীকৃত। দিল্লীর লৌহস্তম্ভের কথাই ধরা যাক। আজকে বিজ্ঞানীরা কলঙ্কহীন ইস্পাত তৈরী করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু দিল্লীর লৌহস্তম্ভে আজও মরিচা পড়ে নি। তা' ছাড়া

এমন সুবৃহৎ একটি স্তম্ভ যার জোড়া কোথাও নেই তেমন একটি স্তম্ভকে নির্মাণ করতে যে কত বড় কারখানার দরকার, সে কথা কি কেউ একবার চিন্তা করেছেন? তাছাড়া ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলোতে যে লোহার কড়ি বরগা ব্যবহৃত হয়েছে তাও রয়েছে অক্ষত। এইসব নির্মাণ করার জন্য কি কারখানা দরকার হত না? কিংবা উন্নত ধরনের লৌহ নিষ্কাশন প্রণালী ভারতের জানা ছিল না? বর্তমান কালে মারুত চুল্লীতে লৌহ নিষ্কাশন করা হয়। পঞ্চাশ থেকে একশ' ফুট উঁচু এই চুল্লীগুলো তৈরী করা খুবই কষ্টকর। লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতির সমুদয় সরঞ্জাম এখনও ভারত তৈরী করতে সক্ষম নয়। বিদেশের সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু সেকালে কোন্ বিদেশী সাহায্য করেছিল দিল্লীর লৌহস্তম্ভে নির্মাণে? কিংবা কোন ইস্পাত নগরী কি গড়ে উঠেছিল ভারতে? তেমন যদি কোন নগরী ছিল তাহলে যন্ত্র ও কারিগরি বিদ্যা কতদূর উন্নত ছিল তা আজকের যে-কোন ইস্পাত নগরীর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। অথবা এমন কোন সহজ ও উঃত কারিগরি বিদ্যার প্রচলন ছিল যার ফলে আধুনিক ইস্পাত নগরী পত্তনের প্রয়োজন হত না। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের আমলে নির্মিত বৃহত্তম কামান 'দলমাদল' আজও রয়েছে অক্ষত। এর শিল্পী সাধারণ এক কামার।

ধাতুবিদ্যা তথা রসায়নশিল্পে ভারত যে এককালে সমৃদ্ধ ছিল সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। কলঙ্কহীন ইস্পাত নির্মাণ, লোহাপাথর থেকে লোহা নিষ্কাশন, পেতল কাঁসা ব্রোঞ্জ প্রভৃতি সঙ্কর ধাতু প্রস্তুতি হামেশাই প্রচলিত ছিল। চোলাই-করণ, পাতন, ঊর্ধ্ব-পাতন, পারদ ও অন্যান্য ধাতু-ভস্ম প্রস্তুতি তৎকালীন রসায়নবিদদের জানা ছিল। মহাবিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসে' উল্লেখ করেছেন।

প্রাচীন কালের রসায়নবিজ্ঞানীদের পরিচয় বিশেষ জানা যায় না। তবে রসশাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন নাগার্জুনের নাম পাওয়া যায়। নাগার্জুনকে নিয়ে আবার গোলমালের অন্ত নেই। এই

নামটিকে ঘিরে যে সমস্ত প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে অনেকে প্রমাণ করতে চান নাগার্জুন নামে অন্ততঃ পক্ষে চারজন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একজন তন্ত্রশাস্ত্র রচয়িতা, একজন রসায়নশাস্ত্রবিদ, একজন চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ এবং আর একজন প্রসিদ্ধ মহাযান শাখার প্রতিষ্ঠাতা দার্শনিক নাগার্জুন। দার্শনিক নাগার্জুনের নাম ভারত বিখ্যাত। তাঁর মত জ্ঞানী ও প্রতিভাধর ব্যক্তি পৃথিবীতে খুবই কম জন্মগ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁর দান অপরিসীম। 'লামাতারনাথের' মতে নাগার্জুন এক সময় নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। তাঁরই সময়ে সুবিষ্ণু নামে একজন অর্থশালী বণিক এখানে একশ' আটটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীক শতক। কল্‌হনের মতে ছিলেন কণিষ্কের সমসাময়িক। রসশাস্ত্রের প্রচলন ও প্রগতি ঘটেছিল তান্ত্রিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে, এবং পরে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রভাব সংকুচিত হতে আরও। সেই বিচারে রসায়নশাস্ত্রবিদ নাগার্জুন অন্তত খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মানুষ।

দার্শনিক নাগার্জুনের জন্মস্থান বিদর্ভনগরী। এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারের তাঁর জন্ম। প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন, পরে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। বুদ্ধের তিরোধানের কয়েকশ' বছরের মধ্যেই বুদ্ধের মূলনীতিগুলিকে নিয়ে বহু গোল-যোগের সৃষ্টি হয়। ফলে উদ্ভূত হল দুটি শাখা, একটি মহাযান অপরটি হীনযান। মহাযানের আবার দুটি শাখা—মাধ্যমিক ও যোগাচার। মাধ্যমিকের প্রতিষ্ঠাতাই নাগার্জুন। নতুন ধর্ম গ্রহণ করার পর বুদ্ধের বাণী জনসাধারণের কানে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি সারা দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করেন। অন্ধ্রের রাজা শাতবাহন তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত নাগার্জুন থেকেই। মাধ্যমিক শাখাকে এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর তিনি স্থাপন

করেছিলেন যে, প্রায় দু'শ বছর ধরে শাতবাহন বংশ এবং শাতবাহন বংশের পর ইক্ষ্বাকুবংশীয় সম্রাটগণ বৌদ্ধধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে গৌতমীপুত্র শাতকর্ণী, যজ্ঞশাতকর্ণী ইক্ষ্বাকুবংশীয় বাশিষ্ঠীপুত্র চাণ্ডমূল ও রুদ্রপুরুষদত্ত প্রধান।

পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ দার্শনিক নাগার্জুন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন না; জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতিতেও ছিলেন পারদর্শী। এমনও শোনা যায় যাদুবিদ্যায় তাঁর নাকি খ্যাতি ছিল সুদূর বিস্তৃত। তবু মনে হয় না দার্শনিক নাগার্জুন ও রসায়ন-শাস্ত্রবিদ নাগার্জুন একজনই। রসায়নবিদ নাগার্জুন সোমনাথের নিকটে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রসরত্নাকর নামে যে গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন তাতে রসশাস্ত্র বিষয়ে প্রায় সমস্ত তথ্যই সংকলিত। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হয়েও তিনি তন্ত্রচর্চা করেছেন। সুশ্রুতসংহিতায় তিনি উত্তরতন্ত্র নামে একটি নতুন অংশ সংযোজন করেন। কক্ষপুট-তন্ত্র, আরোগ্যমঞ্জরী, যোগসার, যোগশতক প্রমুখও তাঁরই রচনা বলে কথিত। একাধিক যন্ত্রের বর্ণনাও তিনি দিয়েছেন যার মধ্যে গর্ভযন্ত্রম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পরবর্তী চিকিৎসাবিদ চক্রপাণি তাঁর দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত। প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী-গুণীদের জ্ঞান কেবলমাত্র একটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁদের প্রতিভা ছিল বহুমুখী।

ময় দানব

যমুনার তীরে এক শুভ্র উপলখণ্ডে উপবিষ্ট কৃষ্ণার্জুন। যমুনার কলধ্বনিতে বার বার রোমাঞ্চিত হচ্ছিল তাঁদের মন। এমন সময় অশীতিপর, শীর্ণদেহ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন তাঁদের সামনে। ব্রাহ্মণের মাথায় ত্রিজটা, চক্ষুদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, তপ্তকাঞ্চনের মত গায়ের রং। কোনও ভূমিকা না করে তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন—"হে যদুকুলশ্রেষ্ঠ এবং পাণ্ডবকুলগৌরব, দয়া করে অনাহারক্লিষ্ট এই বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন। ক্ষুধার জ্বালা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।"

শ্রীকৃষ্ণ কোন কথা বললেন না। কেবল যমুনার প্রবাহমান জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। অর্জুন ব্রাহ্মণের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—"কি প্রকার খাদ্যে আপনার রুচি বলুন ব্রাহ্মণ। যদি বলেন তাহলে অনতি-বিলম্বে আমি পৃথিবীর সমূহ সুখাদ্য আপনার কাছে হাজির করবো।"

গম্ভীর স্বরে ব্রাহ্মণ বললেন—"আগে কথা দাও, আমার ঈপ্সিত খাদ্য তুমি আমাকে প্রদান করবে।"

বিস্মিত অর্জুন প্রশ্ন করলেন—"কে আপনি ব্রাহ্মণ, সামান্য খাদ্যের জন্য আপনি আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে বলছেন? কি চান? কথা দিলাম, যত দুঃসাধ্যই হোক আপনার অভিলষিত খাদ্য প্রদান করবোই।"

হাসলেন ব্রাহ্মণ। প্রথমে কৃষ্ণের দিকে পরে অর্জুনের দিকে তাকিয়েই তিনি বললেন—"আমি দেব হুতাশন। খাণ্ডব নামে যে মহাবন আছে ঐটিই আপনাদের দহন করতে হবে। তবেই হবে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি।"

বিস্মিত অর্জুন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন শিলাসন ছেড়ে—"দেব হুতাশন আপনি! প্রণাম গ্রহণ করুন, দেব। কিন্তু শুনেছি ঐ মহাবনে অজস্র পশুপক্ষী, সর্প, যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব কিন্নরের বাস। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ঐ বনের রক্ষক। হে অগ্নিদেব! দয়া করে বলুন, পৃথিবীতে এত সুখাদ্য থাকা সত্ত্বেও খাণ্ডববনের প্রতি কেন আপনার লোভ?"

হাসলেন দেব বৈশ্বানর। বললেন—"অদ্ভুত সে কাহিনী, পার্থ। সত্যযুগে শ্বেতকী নামে ছিলেন এক ধর্মপ্রাণ রাজা। নিরন্তর যজ্ঞ করাই ছিল তাঁর নেশা! কিন্তু যে সমস্ত ঋত্বিক তাঁর যজ্ঞের ভার নিয়েছিলেন, দীর্ঘ দিন ধরে যজ্ঞ করার ক্লেশ তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না। একদিন সমস্ত ঋত্বিক রাজাকে জানালেন, "হে রাজন! দিবানিশি যজ্ঞকুণ্ডের পাশে বসে বসে আমাদের শরীর হয়ে গেছে যেন একখণ্ড

শুষ্ক কাষ্ঠ। এই দেখুন, আমাদের শরীর তাম্রবর্ণ, শরীরে নেই একটিও লোম। হে নরশ্রেষ্ঠ! অনুগ্রহ করে এ কাজ থেকে আমাদের এবার অব্যাহতি দিন।" ব্যথিত চিত্তে ঋত্বিকদের বিদায় দিলেন রাজা। নিজেও প্রাসাদ পরিত্যাগ ক'রে এক গভীর বনে গিয়ে আরম্ভ করলেন মহাদেবের তপস্যা। দীর্ঘদিন পরে সদয় হলেন দেবাদিদেব। দেখা দিয়ে বললেন, "আমি তোমার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়েছি বৎস। মনোমত বর প্রার্থনা কর।" করজোড়ে রাজা শ্বেতকী বললেন, "হে সর্বশক্তিমান! যদি অধমের প্রতি কৃপা ক'রে থাকেন, তাহলে দয়া করে আমার যজ্ঞের ভার নিন। সুদীর্ঘ কাল ধরে যজ্ঞ করার শক্তি মানুষের নেই। তাই বিপদে পড়ে আপনার শরণ নিয়েছি।" মহাদেব বললেন—"প্রিয় বৎস, যজ্ঞ করার মত আমার সময় নেই। তাছাড়া যজ্ঞ আমি করি না। আমার বরে বিনা যজ্ঞে তুমি ফল প্রাপ্ত হবে।" সবিনয়ে বর প্রত্যাখ্যান করলেন রাজা শ্বেতকী। বললেন, "কর্মব্যতীত কর্মফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা আমার অভিপ্রেত নয় দেবাদিদেব। এত বড় অন্যায়ের জন্য আমায় আর অনুরোধ করবেন না।" খুশী হলেন মহাদেব। বললেন, "আমি মহর্ষি দুর্বাসাকে বলছি; তিনিই তোমার যজ্ঞের ভার নেবেন। রাজ্যে ফিরে গিয়ে তাঁর মনোমত যজ্ঞের আয়োজন কর।"

মহাদেবকে প্রণাম করে উৎফুল্লচিত্তে রাজা চললেন যজ্ঞের আয়োজন করতে। দ্বাদশ বর্ষ ধরে আয়োজন করলেন এক মহাযজ্ঞের। এদিকে মহাক্রোধী দুর্বাসা শিব আজ্ঞা অবহেলা করতে না পেরে কুপিত মনে একদিন প্রবেশ করলেন যজ্ঞশালায়। রাজাকে জব্দ করতে দ্বাদশ বৎসর ধরে অগ্নিতে আহুতি দিলেন রাশি রাশি ঘৃত। বাধ্য হয়ে সমূহ ঘৃতকে ভক্ষণ করতে হয়েছে আমায়। সেই থেকে হল আমার অগ্নিমান্দ্য, কিছুই খেতে পারি না। একদিন অনন্যোপায় হয়ে শরণাপন্ন হলাম প্রজাপতি ব্রহ্মার। সব শুনে তিনি বললেন,—"পৃথিবীতে খাণ্ডব নামে এক মহাবন আছে। সেখানে বাস করে বহু জাতীয় জীব। যদি ঐ বনকে দহন করে দগ্ধ জীবদের আহার কর

তাহলে দূর হবে তোমার অগ্নিমান্দ্য।" ব্রহ্মার কথা শুনে তক্ষুণি চললাম খাণ্ডব দহন করতে। নিজের সমূহ তেজোরাশিকে একত্রিত করে তীব্রভাবে জ্বলে উঠলাম। খাণ্ডবের এক অংশ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, কোথা থেকে ছুটে এল কোটি কোটি হাতি শুঁড়ে জল নিয়ে। অল্পেই নিভিয়ে ফেললো অগ্নি। হতাশ হয়ে ফিরে গেলাম আবার ব্রহ্মার কাছে খাণ্ডব দহন করার উপায় জানতে। প্রজাপতি বললেন, "অনেক দিন ধরে তোমাকে রোগ ভোগ করতে হবে অগ্নি। দ্বাপরে স্বয়ং নারায়ণ ধরার পাপভার লাঘবের জন্য নরনারায়ণ রূপে অবতীর্ণ হবেন ধরাধামে, দহন করবেন খাণ্ডব বন। তোমারও ঘটবে রোগমুক্তি।"

একটু থেমে অগ্নিদেব বললেন,—"হে নারায়ণ! সুদীর্ঘ তিন যুগ ধরে আমি রোগ ভোগ করছি, দয়া করে খাণ্ডব বন দহন করে আমায় রোগমুক্ত করুন।"

সম্মত হলেন অর্জুন। সম্মত হলেন কৃষ্ণ বাসুদেব। অগ্নিদেব খুশী হয়ে অর্জুনকে বরুণদেবের কাছ থেকে আনিয়ে দিলেন কপিধ্বজ রথ, অক্ষয় তূণ ও গাণ্ডীব ধনু। গোবিন্দকে দিলেন কৌমদকী গদা এবং সুদর্শন চক্র। শুভক্ষণে খাণ্ডব বনে অগ্নিসংযোগ করলেন কৃষ্ণার্জুন। ধীরে ধীরে বনময় ছড়িয়ে পড়লো আগুন। পশুপাখি, যক্ষরক্ষ, গন্ধর্বকিন্নর, একে একে আগুনে পুড়ে মরতে লাগলো আর অগ্নিদেব একে একে মুখে পুরতে লাগলেন সবাইকে। কৃষ্ণার্জুন খাণ্ডব বনে অগ্নি সংযোগ করেছেন শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে দলবল নিয়ে এগিয়ে এলেন দেবরাজ ইন্দ্র। যুদ্ধ হল প্রচণ্ডভাবে। কিন্তু সুবিধা করতে পারলেন না দেবরাজ। রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন দলবল সহ। এদিকে খাণ্ডব বন আরও তীব্র ভাবে জ্বলতে লাগল। তার লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশও স্পর্শ করতে লাগলো। এক সময় দেখতে পেলেন অগ্নিদেব, এক বিরাটকায় বৃদ্ধ দানব পালিয়ে যাচ্ছেন বন ছেড়ে। ছুটলেন অগ্নিদেব তাঁকে ধরতে। শ্রীকৃষ্ণও দেবতাদের চিরবৈরী দানবকে সংহার করতে এগিয়ে দিলেন

সুদর্শন ; সামনে সুদর্শন, পেছনে মৃত্যুরূপী স্বয়ং অগ্নি। প্রাণভয়ে ভীত দানব চিৎকার করে উঠলেন, "হে বীর ধনঞ্জয়! রক্ষা কর, রক্ষা কর আমায়। স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে শরণাপন্নকে রক্ষা করতে ছুটে যাচ্ছিলেন অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণ ধরে ফেললেন তাঁকে। ভক্তের সম্মান রক্ষার্থে বাসুদেব সংবরণ করলেন সুদর্শনকে। নিষেধ করলেন অগ্নিদেবকে। ছুটতে ছুটতে এসে দানব লুটিয়ে পড়লেন কৃষ্ণার্জুনের পদতলে। অর্জুন বললেন, "কে তুমি?" দানব ধীরে ধীরে বললেন, "কশ্যপের পুত্র আমি দানবশ্রেষ্ঠ ময়। দক্ষকন্যা দিতি আমার মা, নমুচির আমি সহোদর।" একটু থেমে আবার বললেন, "ত্রেতায় রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর পিতা আমি। যন্ত্রবিদ্যা ও স্থাপত্যবিদ্যায় দানব কুলের বিশ্বকর্মা। বলুন ধনঞ্জয়, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?" অর্জুন হেসে বললেন, "স্বয়ং গোবিন্দ যার সহায়, তার পার্থিব সম্পদে প্রয়োজন কি! বরং বাসুদেবকেই জিজ্ঞাসা কর তাঁর কোন উপকার করতে পার কিনা?" কৃষ্ণ হেসে বললেন, "হে দানব-শ্রেষ্ঠ ময়! শুনেছি তোমার তুল্য শিল্পী পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই। তুমি যদি নিতান্তই অর্জুনের জন্য কিছু করতে চাও, তাহলে ইন্দ্রপ্রস্থে নির্মাণ কর এমন এক মনোহর পুরী যার তুল্য পুরী ত্রিভুবনে নেই।"

খুশী হয়ে চলে গেলেন ময় দানব। এক মাসের মধ্যে নির্মাণ করলেন অতুলনীয় এক মনোহর প্রাসাদ এবং দুর্লভ মণিমুক্তাখচিত, অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত এক রাজসভা। দেবতারা আশ্চর্য হলেন সভা দেখে, কিন্তু ময় দানব এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। মৈনাক পর্বত থেকে অসুররাজ বৃষপর্বার গদা এনে দিলেন মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে এবং অর্জুনকে দিলেন দেবদত্ত শঙ্খ।

খাণ্ডব দাহনের কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য কিনা সে প্রশ্ন নিরর্থক। তবে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে একটি সুপরিকল্পিত নগরী প্রাচীন ভারতে যে বর্তমান ছিল সে সম্বন্ধে বিশ্বাস না করার কোন হেতু নেই। কেবলমাত্র ইন্দ্রপ্রস্থ নয়, আরও বহু নগরী ময় দানবের পরিকল্পনায়

নির্মিত হয়েছিল সে কথা বহু পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। অসুররাজ বৃষপর্বার রাজধানীও ময় দানব তৈরী করেছিলেন। অতএব অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ময় দানব কত বড় স্থপতি ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। শুধু তাই নয়, যন্ত্রবিদ্যায়ও তিনি ছিলেন কুশলী। বিশেষতঃ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। জামাতা রাবণকে তিনি যে মহা শক্তিশেল দান করেছিলেন, তাকে ব্যর্থ করার ক্ষমতা তৎকালীন দেবতা, অসুর, মানব কারও ছিল না। তাই লক্ষ্মণকে বরণ করতে হয়েছিল মৃত্যু।

সূর্যসিদ্ধান্ত নামে একখানা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যার বই পাওয়া গেছে। বইটি আজও প্রচলিত। অনেকের মতে সূর্য-সিদ্ধান্তই গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার আদি গ্রন্থ। রচয়িতা ময় দানব। পুরাণে বর্ণিত ময় দানব ও সূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতা ময় দানব একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলার উপায় নেই। পুরাণে ময় দানবের পরিচয় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে তাতে সূর্যসিদ্ধান্তের রচয়িতা বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

পুরাণে ময় দানব শিল্প-পণ্ডিত ও যন্ত্রবিদ্যা-কুশলী। মৎস্যপুরাণ মতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য প্রবর্তিত নিখিল শিল্পবিদ্যার অধীশ্বর। ময় স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এমনকি লৌহের ব্যবহার করতেন। তাঁরই স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহ নির্মিত তিনটি দুর্ভেদ্য পুরী ধ্বংস করেই মহাদেব ত্রিপুরারি আখ্যা লাভ করেছিলেন। ময় দানব (?) রচিত সূর্য-সিদ্ধান্ত আজও আমাদের পরম বিস্ময়ের বস্তু। বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত বলে যে গ্রন্থখানি প্রচলিত সেটি অবশ্য আদি গ্রন্থ নয়। তার কারণ হিসাবে বলা যায় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির তাঁর গ্রন্থে সূর্যসিদ্ধান্ত থেকে যে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন সে সমস্ত শ্লোক বর্তমানে প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্তে নেই। এমন কি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে সেনবংশীয় সম্রাট বল্লাল সেন তাঁর অদ্ভুতসাগর গ্রন্থেও সূর্যসিদ্ধান্তের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলিও পাওয়া যায় না। তাই বলা যেতে পারে আদি সূর্যসিদ্ধান্ত

গ্রন্থখানি লুপ্ত। সূর্যসিদ্ধান্তে কেবলমাত্র গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা আলোচিত হয় নি, এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, যন্ত্রাদি নির্মাণ পদ্ধতির বর্ণনা। তৎকালে যন্ত্রাদি নির্মাণের জন্য কাঠ, তামা, পারদ, বালি তেল, সুতো প্রভৃতি উপাদানের প্রয়োজন হত। সূর্যসিদ্ধান্তে শঙ্কু, ধনু, চক্র, বানর, ময়ুর প্রভৃতি যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। এইসব যন্ত্র যে প্রকৃতপক্ষে কি ধরনের ছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে প্রাচীন ভারতে যন্ত্র যে নির্মিত হত একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রামায়ণ ও মহাভারত একাধারে ইতিহাস, আখ্যান, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র, প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির এক মহা কোষগ্রন্থ। তাঁদের মতবাদ যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে ময় দানবকে অস্বীকার করি কি করে? সূর্যসিদ্ধান্ত আজও প্রচলিত। যদি তার রচয়িতা ময় দানবই হয়ে থাকেন তাহলে যাঁরা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীতে সংশয় প্রকাশ করেন তাঁরাও ভেবে দেখতে পারেন এই দুই মহাকাব্যের কাহিনীতে কিছুটা অতিরঞ্জন যদিও থাকে তাহলে ভিত্তিহীন একেবারেই নয়।

ভারতীয় লৌহশাস্ত্র ও পতঞ্জলি

প্রাচীন ভারত ধাতুশিল্পে যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মনীষী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সে বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করে গেছেন। আবার প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত তাদের মধ্যে ধাতুবিদ্যা ছিল অন্যতম। সে যুগে অনেকেই ছিলেন ধাতুবিদ্যাবিশারদ। তাঁদের সবার পরিচয় দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। কেবলমাত্র দু-একজন যাঁরা কালজয়ী খ্যাতির অধিকারী এবং যাঁদের পুস্তক আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাঁদেরই সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করা হল।

এঁদের প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে প্রাচীনকালের ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলার প্রয়োজন। আমরা জানি, সভ্যতার আদি যুগে মানুষ প্রথম যে ধাতুটির পরিচয় লাভ করেছিল—সেটির নাম তামা। এই যুগকে ঐতিহাসিকগণ তাই নাম দিয়েছেন তাম্রযুগ। তাঁদের মতে, এই যুগের স্থিতিকালও বেশ কয়েক হাজার বছর। তাম্রযুগের শেষের দিকে মানুষ আরও কয়েকটি ধাতুর পরিচয় পেয়েছিল। সেগুলির মধ্যে দস্তা, টিন, সোনা প্রধান। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে তারা ব্রোঞ্জ নামে একটি সঙ্কর ধাতুও তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাচীন সভ্য দেশগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে লৌহ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ ব্রোঞ্জ দিয়ে অলঙ্কার, বাসনপত্র, মূর্তি প্রভৃতি নির্মাণ করত। সে যুগে ভারতীয়রা ধাতুবিদ্যায় সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তামা, দস্তা, টিন,

সোনা, এমনকি পারদের সঙ্গেও তাদের পরিচয় হয়েছিল সেই সুদূর অতীতে। লোহার সন্ধান তারা কবে পেয়েছিল সে কথা সঠিকভাবে জানা না গেলেও খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারত লৌহশিল্পে উন্নতি লাভ করেছিল বলে পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতিও অজ্ঞাত, তবে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রচিত একখানি বই পাওয়া গেছে এবং খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর কিছু কিছু লোহার নমুনাও পাওয়া গেছে। বইখানির নাম লৌহশাস্ত্র, রচয়িতা ভগবান পতঞ্জলি। এই গ্রন্থে কেবল লৌহ নয়, আরও কয়েকটি ধাতুর নিষ্কাশন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও আছে সঙ্কর ধাতু প্রস্তুতি, ধাতুর বিশুদ্ধি-করণ এবং ধাতব লবণ প্রস্তুতপ্রণালী। সঙ্কর ধাতুর পরিচয় যদিও পতঞ্জলির বহু পূর্বে ভারত জানতে পেরেছিল তথাপি সে যুগের লেখা কোন বই পাওয়া যায় না। তবে কিছু কিছু নমুনা আজও দৃষ্ট হয়। এই দিক থেকে পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্রই ধাতুবিদ্যার একমাত্র প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

পতঞ্জলির পূর্বে ধাতু নিষ্কাশন এবং সঙ্কর ধাতু নির্মাণ এক শ্রেণীর কারিগরদের জানা ছিল। তারা বংশানুক্রমে এই কাজ করে আসত—লিখে রাখার কোন প্রয়োজন হত না। বৃত্তি ছিল সে যুগে বংশানুক্রমিক। পিতার বৃত্তি পুত্র বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করত। কালক্রমে ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন আসতে থাকে বারবার। তার ফলে সেইসব শিল্পী সম্প্রদায় হারিয়ে গেল চিরতরে। তাদের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল ভারতের প্রাচীন ধাতু শিল্প তথা ভারতের গৌরব। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় চারশ বছর আগে থেকে হাজার বছর ধরে বহু মনীষী ধাতু নিষ্কাশনের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই সব মনীষীদের মধ্যে ভগবান পতঞ্জলির নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনিই বোধহয় প্রথম ব্যক্তি যিনি ধারাবাহিকভাবে ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মনে হয়, পতঞ্জলির পূর্বেও ধাতুবিদ্যার পুস্তক প্রচলিত ছিল। তা না হলে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেমন করে ধাতুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া

হত ? কেবল অধ্যাপকেরা স্মৃতি থেকেই উদ্ধার করতেন ?

পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্রে পাঁচটি অতি পরিচিত ধাতুর বর্ণনা আছে। ধাতুগুলি যথাক্রমে লৌহ, তাম্র, টিন, দস্তা ও পারদ। এদের প্রত্যেকটির নিষ্কাশন পদ্ধতি এবং তৎসহ কয়েকটি সঙ্কর ধাতুর পরিচয়ও স্থান পেয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান ধাতুশিল্পকে করেছে সমৃদ্ধতর। বহু ধাতুর পরিচয় পেয়েছে মানুষ ; মানব সভ্যতার অগ্রগতির পিছনে ধাতুর দানও যথেষ্ট। তবে অতি প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির মধ্যে উল্লিখিত কয়েকটি ধাতু অ্যালুমিনিয়ামই প্রধান। অ্যালুমিনিয়ামের ইতিহাস আবার খুবই সংক্ষিপ্ত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই আবিষ্কার করা হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের সহজ পদ্ধতি। মাত্র শ-তিনেক বছর আগে অ্যালুমিনিয়াম সম্বন্ধে কোন দেশের জ্ঞান ছিল না। যখন এর পরিচয় পাওয়া গেল তখন হাল্কা ধাতু বলে ধাতু নিষ্কাশনের সনাতন পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করাও সম্ভব হয়নি। লৌহ, তাম্র, দস্তা প্রভৃতি ভারী ধাতুর বেলায় আজকাল অনেক নতুন নতুন নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও ওদের আকরিককে সুবিধামত ধাতব অক্সাইডরূপে রূপান্তরিত করা হয়। পরে সেই অক্সাইডকে কয়লার দ্বারা বিজারিত করে ধাতুকে নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। এই নীতি পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে অনুসৃত হয়ে থাকে। যেমন আজকাল লোহা নিষ্কাশনের মূল পদ্ধতিটি হল, প্রথমে লোহার আকরিককে পুড়িয়ে ফেলা। তারপর সেই পোড়া আকরিকের সঙ্গে কয়লা ও চুন মিশিয়ে মারুতচুল্লীতে প্রচুর তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপে লোহা-পাথরগুলো গলে যায় এবং কয়লার দ্বারা ধাতুতে পরিণত হয়। এই পদ্ধতিটি লোহার অক্সাইড আবিষ্কারের বেলায় প্রযোজ্য। পৃথিবীর প্রায় সব লোহাই অক্সাইড আকরিক থেকে নিষ্কাশিত হয়। তামার ক্ষেত্রেও যদি অক্সাইড কিংবা কার্বনেট আকরিক পাওয়া যায় তাহলেও প্রথমে পুড়িয়ে ফেলে তারপর কয়লার দ্বারা বিজারিত করে নিলেই তামা পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই জাতীয় আকরিক খুব কম পাওয়া যায়। তাম্রমাক্ষিক

বা কপার পিরাইটিস্ থেকেই এখন বেশীরভাগ তামা নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে। তামা আবার মুক্ত অবস্থায় কিছু কিছু পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, তামা মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় বলেই মানুষ প্রস্তরযুগে পাথর খুঁজতে খুঁজতে একদিন তামার সন্ধান পেয়েছিল। পাথরের চেয়ে তামা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, পাথরের পরিবর্তে তামার প্রচলন শুরু হয়েছিল। প্রাচীনকালে তামার ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল যে বেশীর ভাগ মুক্ত তামাকে সেদিনের মানুষ ব্যবহার করে প্রায় শেষ করে দিয়ে গেছে। কিছু কিছু মাত্র তাদের হাত এড়িয়ে ভূগর্ভে অবস্থান করছে।

উপরে বর্ণিত ধাতু নিষ্কাশনের সাধারণ উপায়টি পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্রে পাওয়া যায়। লৌহ নিষ্কাশনের প্রাচীন পদ্ধতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

ধাতব আকরিককে এক জায়গায় জড় করে কয়লা, কাঠ এবং আরও কতকগুলি জিনিস একত্রে মিশিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে গলানো হত। তারপর গলিত লৌহকে কাঠকয়লায় তৈরি এক রকম উনানে উত্তপ্ত করা হত। তখন ইস্পাত বলতে কোন কিছু ছিল না। এই উপায়ে নিষ্কাশিত লোহার মান ইস্পাতের চেয়েও উন্নত হত। বিশেষ বিশেষ সময় এর মান এত উন্নত হত যে দীর্ঘকাল ধরে মরচে পড়ত না, নিষ্কাশন পদ্ধতি, কারিগরের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করত। কলঙ্কহীন ইস্পাতও সে যুগে তৈরী হত। কুমারগুপ্তের আমলে নির্মিত দিল্লীর লৌহস্তম্ভের গায়ে এখনও মরচে পড়েনি। কোণারকে সূর্যমন্দিরে ব্যবহৃত কড়ি-বরগাগুলো আজও অক্ষত। অথচ বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনে বিজ্ঞানীরা কলঙ্কহীন (স্টেন্‌লেস্) ইস্পাত তৈরি করার জন্য কী পরিশ্রম না করে চলেছেন। তবুও কৃতকার্য হতে পারছেন না। ক্রোমিয়াম, নিকেল প্রভৃতি ধাতুকে লোহার সঙ্গে বিশেষ অনুপাতে মিশিয়ে মরচেহীন ধাতুসঙ্কর তৈরি করছেন। সেযুগে ক্রোমিয়াম কিংবা নিকেল আবিষ্কৃত হয়নি। আবার আবিষ্কৃত হয়নি তড়িৎ এবং তার গুণাবলী। কেবলমাত্র

লোহা থেকে কলঙ্কহীন ইস্পাত—আজকের দিনেও বিস্ময় উদ্রেক করে। শোনা যায়, গুপ্তযুগের অনেক আগে ভারতীয় কারিগররা কলঙ্কহীন ইস্পাত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে ভারতে প্রস্তুত লোহার মান ছিল যথেষ্ট উন্নত। মহাবীর আলেকজান্দার ভারত থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন এমন নজির আছে। সেযুগের উন্নত জাতের ইস্পাতপ্রস্তুতপ্রণালী আজ সম্পূর্ণরূপে জানা না গেলেও পতঞ্জলির লৌহশাস্ত্রে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, লোহা-পাথরকে পুড়িয়ে লোহা নিষ্কাশন করে নেওয়ার পর কাঠকয়লার চুল্লীতে পুনরায় পোড়ান হত। কাঠকয়লার চুল্লী অবশ্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। কয়লা উত্তম বিজারক। ধাতব অক্সাইডকে বিজারিত করে ধাতুতে পরিণত করতে হলে কয়লা ছাড়া উপায় নেই। আধুনিক ইস্পাত তৈরির জন্য যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে বিসিমার পদ্ধতি ও সিমেন্স মার্টিন পদ্ধতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইস্পাতের তৈরি কাঠামোর ভেতরে একটা প্রলেপ অবশ্য দেওয়া থাকে। আকরিকের মধ্যে ফসফরাসের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুযায়ী দু-ধরনের প্রলেপের ব্যবস্থা আছে। হয় আম্লিক প্রলেপ, নয়তো ক্ষারীয় প্রলেপ। পতঞ্জলি-বর্ণিত চুল্লীতে কোন প্রলেপ কিংবা চুল্লীর কাঠামো সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নি। বর্ণিত হয়েছে, চুল্লীটি কেবলমাত্র কাঠ-কয়লা দিয়ে নির্মিত। বর্তমানেও দেখি, ইস্পাত তৈরি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে একরকমের মিশ্রণ যোগ করা হয়, তাতে অবশ্য কয়লা থাকে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারত কবে যে লোহা এবং পাথরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ভারতের প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতায় লৌহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন মেসোপটেমিয়া ও এশিয়া মাইনর সর্বপ্রথম লোহার পরিচয় পায়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে সম্ভবতঃ আর্মেনিয়ানরাই লৌহ নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেই লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি আর্মেনিয়ানদের কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়ে সারা

ইউরোপে। হয়তো এই সময় ভারতও লোহার কথা জানতে পারে এবং অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান হিসাবে লোহাকে ব্যবহার করে।

পণ্ডিতদের এই অনুমান কতখানি সত্য ঠিক করে বলা যায় না। অনেকে আবার বলেন, বহিরাগত আর্যগণ লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন। তাঁরা ভারতে এসেছিলেন খ্রীষ্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগে। অপরপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যদি আর্মেনিয়ানরা লৌহ নিষ্কাশনে সমর্থ হয়েছিলেন তাহলে মাত্র একশ বছরের মধ্যে ভারত তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে এমন উন্নত লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলল যা আলেকজান্দার এবং তাঁর অভিজ্ঞ সেনাপতিরা দেখে অবাক হয়েছিলেন ?

আমরা যদি বলি ভারতই লৌহ আবিষ্কার করেছিল তাহলে বিদেশীরা ক্ষুণ্ণ হবেন এবং চারদিক থেকে তর্কের ঝড় উঠবে। কিন্তু একটা প্রশ্ন—ভগবান বুদ্ধেরই তো আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী। তাঁর সমসাময়িক যে সমস্ত পরাক্রান্ত রাজার পরিচয় পাই তাঁরা কি যুদ্ধে লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন না ? সেই সব রাজবংশ কি গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে কয়েক-শ বছর ধরে ভারতবর্ষ শাসন করেন নি ? মনের কোণে অনেক প্রশ্নই উঁকি মারে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে। ভাবতে ইচ্ছে হয় ভারত থেকেই এককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের বাইরে। হয়তো আর্যরাও বহিরাগত নন—অতি প্রাচীনকালে ভারত থেকেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন নানাদেশে। গ্রীক, লাতিন ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভাষার মিল দেখে আমরা বলি আদি ইন্দোইরানীয় ভাষাগোষ্ঠী থেকে উৎপন্ন হয়েছিল এই সব ভাষা। সেই আদি ভাষাগোষ্ঠীর জন্মস্থান রুশ দেশে না হয়ে ভারতে উৎপন্নও তো হতে পারে! এ প্রশ্নের জবাব হয়তো একদিন পাওয়া যেতে পারে।

যাইহোক, ইতিহাস থেকে যা জানা যায় তা হল ভারতে প্রাচীন-ব্যবহৃত যে সব লোহার নমুনা এখন পাওয়া যায়, গবেষকগণ অনুমান করেছেন সেগুলির কোনটিই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে নয়। খ্রীষ্টীয়

দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দী থেকেই লোহার ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। সেই সময় ভারতে আবিষ্কৃত হয় উন্নত লৌহনিষ্কাশন প্রণালী। তবে একথা সত্য যে আজকের মতো এত প্রচুর লৌহ নিষ্কাশন তখন সম্ভব হত না। এক একটি চুল্লীর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র দশ-বিশ কিলোগ্রামের মত।

লৌহশাস্ত্র রচয়িতা পতঞ্জলি সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রাদির বেশ কয়েকটিতে পতঞ্জলির নাম পাওয়া যায়। আবার পতঞ্জলি নামের সঙ্গে যে সব শাস্ত্রের নাম যুক্ত সেগুলিও এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথম ও প্রধান পুস্তক পাণিনির মহাভাষ্য। এই পুস্তকখানিতে পতঞ্জলি যে সাহিত্য ও ব্যাকরণ জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অদ্যাবধি খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পুস্তক যোগদর্শন ভারতের সর্বকালের একখানি শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ। যোগদর্শন রচয়িতা পতঞ্জলিকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক বললেও অত্যুক্তি হয় না। তৃতীয় গ্রন্থ বহু প্রাচীন ও নবীন গবেষকদের মতে চরকসংহিতা। চরকসংহিতার মত দ্বিতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র পৃথিবীতে কোনদিন রচিত হবে কিনা সন্দেহ। হাজার হাজার বছর পরেও যোগদর্শন ও চরকসংহিতার মূল্য এতটুকু হ্রাস পায়নি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। চতুর্থ গ্রন্থ লৌহশাস্ত্র লেখকের অসাধারণ রসায়ন জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। এখন প্রশ্ন, বৈয়াকরনিক, দার্শনিক, শরীরবিজ্ঞানী ও রসায়নবিজ্ঞানী পতঞ্জলি কি একই ব্যক্তি?

ইতিহাসে একাধিক আর্যভট্ট, ভাস্কর, নাগার্জুন এবং চরকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পতঞ্জলি ইতিহাস স্বীকার করে না। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী পতঞ্জলি ভারতের এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ বলতে ব্যাস, বাল্মীকি, পতঞ্জলি, নাগার্জুন, বুদ্ধ, শঙ্কর, কালিদাস, অশ্বঘোষ, আর্যভট্ট এবং ভাস্করাচার্যকে বোঝায়।

বিভিন্ন শাস্ত্র পতঞ্জলিকে বলেছেন গোণিকাপুত্র। শব্দকল্পদ্রুমের মতে তিনি গোণর্দীয়। তাঁর জন্মস্থান বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত

গোণ্ডা নামক একটি স্থান। জন্মকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ। পতঞ্জলি সম্বন্ধে আরও একটি মত প্রচলিত। অনেকে তাঁকে অনন্তনাগের অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে দুঃখ-কষ্ট দূর করতে ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশে একবার অনন্তনাগ মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ধরাধামে। তিনি ভগবান পতঞ্জলি। এই মতে যাঁরা সমর্থক, তাঁরা পতঞ্জলি রচিত মহাভাষ্যটিকে "ফণিভাষ্য" নামে অভিহিত করেন।

পতঞ্জলি কোথায় এবং কিভাবে শিক্ষালাভ করেন সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না। তাঁর সময় ভারতে ছিল একটি শিক্ষায়তন। তক্ষশীলা তার নাম। পাণিনি এবং মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ও কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কৌটিল্য তক্ষশীলার ছাত্র ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। তক্ষশীলা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। পতঞ্জলির সময়ও ঐ শিক্ষায়তনটির প্রভাব বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল পতঞ্জলি হয়ত তক্ষশীলারই ছাত্র ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় উত্তর ভারতে বিরাজ করছিল চরম অরাজকতা। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মৌর্যযুগের অবসান। তাঁরই আমলে মৌর্যবংশের শেষসম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যসাম্রাজ্য অধিকার করেন। শোনা যায়, পুষ্যমিত্রও ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক। মৌর্যবংশের শেষ বংশধরকে বধ করলেও রাজ্যের অতি অল্প অংশই নিজের অধিকারে এনেছিলেন। বিদিশা, বিদর্ভ প্রভৃতি রাজ্যগুলি তাঁকে অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। পুষ্যমিত্র পরে এই রাজ্যগুলিকে নিজ অধিকারভুক্ত করেছিলেন। আরও কিছু পরে পুষ্যমিত্রপৌত্র বসুমিত্র বাহ্লীক দেশীয় গ্রীকদের প্রতিহত করেছিলেন। এই দুই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য পুষ্যমিত্র দুটি অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। সেই সময় দেশ বৌদ্ধধর্মের বন্যায় উত্তাল— ব্রাহ্মণ্যধর্ম নিঃশেষিতপ্রায়। কোনো ঋত্বিক্ খুঁজে পাননি পুষ্যমিত্র। শেষে অনেক অনুসন্ধানের পর পেয়েছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ পতঞ্জলিকে।

পতঞ্জলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরম প্রীতিলাভ করেছিলেন পুষ্যমিত্র। পতঞ্জলি সম্রাটের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঋত্বিকের ভার গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায়, তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে পুষ্যমিত্র তাঁকে মহাসমাদরে রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন।

পতঞ্জলি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও কোনোরকম ধর্মের প্রতি তিনি কোনদিন বিদ্বেষ পোষণ করেননি। পরন্তু তাঁর কার্যাবলীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাই লক্ষ্য করা যায়। তাঁরই প্ররোচনা ও ও প্রচেষ্টায় পুষ্যমিত্র সুপ্রসিদ্ধ ভারহূত স্তূপ এবং সাঁচী স্তূপের দ্বারদেশে স্তূপগুলিকে রক্ষার জন্য নির্মাণ করেছিলেন এক সুদৃশ্য লৌহপ্রাচীর। পুষ্যমিত্রকেও অনেকে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী বলে মনে করে থাকেন। একথা অবশ্য সত্য নয়। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর যদি বিদ্বেষ থাকত তাহলে ভগবান বুদ্ধের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে যত্নবান হতেন না। আজও তাঁর সে কীর্তি বৌদ্ধশিল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে পরিগণিত।

মোটকথা পতঞ্জলি কোন ধর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন না। তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন মানুষকে। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষকে ভালবাসাই ছিল তাঁর একমাত্র ধর্ম। এই দিক থেকে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত মিল। ধর্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী তাঁকে কোনদিন বিভ্রান্ত করে নি। কোন ধর্মপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মানুষের ত্রুটি নিরাময়। তাঁর ধারণা ছিল মানুষের দোষ ত্রিবিধ। বাক্যের দোষ, মনের দোষ এবং শরীরের দোষ। বাক্যের দোষ দূর করতে তিনি রচনা করেছিলেন পাণিনির মহাভাষ্য, মনের দোষ নিবারণের জন্য যোগদর্শন বা পাতঞ্জলদর্শন এবং শরীরের দোয নিবারণের জন্য চরকসংহিতা। এই তিনখানি পুস্তকই ভারতের তিনখানি অমূল্য রত্ন। অথচ তাঁর মহান উদ্দেশ্য আমরা আজও সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। তাই পতঞ্জলির মত অবতারকল্প মহাপুরুষ আমাদের অনেকের কাছে অজ্ঞাত। একটি মহান জাতির পক্ষে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে?

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে পতঞ্জলি দেহরক্ষা করেন।

ভারতীয় অর্থশাস্ত্র ও চাণক্য

চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত এবং বিন্দুসারকে ঘিরে কিংবদন্তীর অন্ত নেই। সেই সব কিংবদন্তীর একটি হল, বিন্দুসারের জন্ম সংক্রান্ত।

চাণক্য ছিলেন অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ও কূটকৌশলী। মৌর্য্য-সাম্রাজ্য স্থাপন করার পরেও চন্দ্রগুপ্তের ছিল বহু শত্রু। মৃদু বিষ-ক্রিয়ার প্রভাবে চাণক্য গোপনে তাদের হত্যা করার জন্য রাজপ্রাসাদ থেকে অতি উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে মাঝে মাঝে উপঢৌকন দিতেন। সেই মিষ্টান্নে মিশ্রিত করা হতো অল্প অল্প বিষ। বলা বাহুল্য রাজপরিবারের এবং সম্রাটের প্রিয়জনদের সে সব মিষ্টান্ন দেওয়া হত না।

দৈবক্রমে একদিন সেই মিষ্টান্নের একটি চন্দ্রগুপ্তের মহিষীর হস্তগত হয়। তিনি ওর সুমধুর গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ গলাধঃকরণ করেন। মহিষী ছিলেন গর্ভবতী। যথাসময়ে সংবাদটি চাণক্যের কর্ণগোচর হলে, চাণক্য রাজমহিষীর গর্ভস্থ সন্তানকে অস্ত্রোপচারের দ্বারা বহিষ্কৃত করার ব্যবস্থা করেন এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে শিশুকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেন। এই শিশুই মহারাজ বিন্দুসার।

কিংবদন্তীকে বিশ্বাস করতে নেই। তবে প্রশ্ন জাগে, আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান যেখানে হিসসিম খেয়ে যাচ্ছে সেখানে প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞান কী এত সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল? রচনা করতে কী পেরেছিল, গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কৃত্রিম পরিবেশ?

ইতিহাসে চাণক্যের যে ছবি আমরা দেখতে পাই, তাতে চাণক্যের অসাধ্য কিছু ছিল না বলে মনে হয়। তাঁর রচিত অর্থশাস্ত্র থেকে এমন তথ্য অবশ্য লাভ করা যায় না। তবে তিনি যে একজন বড় বিজ্ঞানী ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চাণক্য বা কৌটিল্যের

লেখা অর্থশাস্ত্র প্রাচীন ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। গ্রন্থটি থেকে একদিকে যেমন সে যুগের ভারতবর্ষের একটা নিখুঁত রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক ছবি পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনই বিজ্ঞানের বেশ কিছু তথ্য লাভ করা যায়। বিশেষতঃ অর্থশাস্ত্র তৎকালীন ভারতীয় রসায়নচর্চার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটির আরও একটি বৈশিষ্ট্য, এতে কতকগুলি ধাতু ও ধাতুসঙ্করের প্রস্তুত প্রণালী এবং ব্যবহারবিধি বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থশাস্ত্রে কতগুলি আকরিকের উল্লেখ করা হয়েছে। সেই আকরিকগুলি থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, লৌহ প্রভৃতি ধাতু নিষ্কাশন করা হত। নিষ্কাশন পদ্ধতি যেমন বর্ণনা করা হয়েছে তেমনই পিতল, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি সঙ্কর ধাতুগুলির প্রস্তুত প্রণালীও বর্ণিত হয়েছে।

অর্থশাস্ত্র থেকে আরও জানা যায়, মুদ্রা প্রস্তুতির জন্য সে সময় স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং নানা মিশ্র ধাতু ও পারদ সংকর (অ্যামালগাম) ব্যবহার করা হত। চাণক্য উক্ত গ্রন্থে খনিতত্ত্বাবধায়কদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং কর্তব্য সম্বন্ধেও নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

কতকগুলি রাসায়নিক পদ্ধতিরও বর্ণনা আছে অর্থশাস্ত্রে। সেই থেকে জানা যায় সে যুগে চাল, গম, যব, চিনি, মধু, আঙুর ও অন্যান্য ফলের রস থেকে সন্ধিত পানীয় প্রস্তুত করা হত। নানা রকম তৈল বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশন করা হতো। এমনকি সুগন্ধি তৈলের প্রস্তুত প্রণালী জানা ছিল। তাছাড়াও আছে কাচ শিল্পের কথা। রঙীন কাচের প্রস্তুত প্রণালী চাণক্যের আমলের পূর্বেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

চাণক্যের জন্মস্থান তক্ষশীলা। পিতার নাম ছিল চনক। তার আরও দুটি নাম ছিল। সে নামগুলি হল বিষ্ণুগুপ্ত এবং কৌটিল্য। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নানা শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করে তিনি অর্থোপার্জনের জন্য পাটলিপুত্রে এসেছিলেন। তখন ছিল পাটলিপুত্রে নন্দবংশীয় রাজাদের আমল। কোন কারণে একদিন সম্রাট তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে চরম অপমান করেছিলেন। সেই থেকে কুপিত হয়েছিলেন চাণক্য এবং নন্দবংশ ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন।

চাণক্যের ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে নন্দবংশে আর বাতি দিতে কেউ ছিল না। পথের ধুলা থেকে একরকম কুড়িয়ে এনে চন্দ্রগুপ্তকে স্থাপন করেছিলেন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে এবং নিজেই হয়েছিলেন তাঁর মহা-মন্ত্রী। চাণক্যের জীবনের অসাধারণ কাহিনী আজও কিংবদন্তীর মত মনে হয়। এককালে তাঁরই কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছিল মুদ্রারাক্ষস নামে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক।

চাণক্য রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অর্থশাস্ত্র এবং রাজনীতি শাস্ত্র প্রধান। পরবর্তী গ্রন্থখানি ভোজরাজের আদেশে সংকলিত হয়েছিল। চাণক্য নীতিশাস্ত্র, চাণক্য নীতিদর্পণ, বৃদ্ধচাণক্য, লঘুচাণক্য প্রভৃতি কয়েকখানি বই তাঁরই লেখা বলে অনেকে অনুমান করেন। [অনেকের মতে চাণক্য নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। পরবর্তীকালে তাঁর নীতি অপরে পুস্তকের আকারে প্রকাশ করে।]

রণপণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ এবং কূটনীতিবিদ চাণক্যকে "প্রাচ্যের ম্যাকিয়াভেলি" বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাসে দ্বিতীয় চাণক্য নেই।

আচার্য দৃঢ়বল

চরকসংহিতা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত থাকায় বিভিন্ন চিকিৎসক ও টীকাকারদের হাতে পড়ে সংহিতাটির অঙ্গহানি ঘটেছিল। কোথাও হয়েছিল সংযোজন, আবার কোন কোন জায়গায় অতীব মূল্যবান তথ্যকেও বাদ দেওয়া হয়েছিল। কয়েকশ বছর পরে চরকসংহিতার সংস্কার করার প্রয়োজন অনুভূত হয়ে পড়ল। সেই সময় বহু মনীষী চরকসংহিতার সংস্কার করার কথা চিন্তা করলেও এই দুরূহ কর্মে হস্তক্ষেপ করতে কেউ সাহসী হননি। শেষে আয়ুর্বেদাচার্য দৃঢ়বলের চেষ্টায় ও যত্নে চরক সংহিতার নবরূপায়ণ ঘটল। দৃঢ়বল ছিলেন একদিকে সুচিকিৎসক, অপরদিকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাই

তিনি কেবল চরকসংহিতাকে সংস্কার করে ক্ষান্ত হননি, নবাবিষ্কৃত বহু তথ্যও তাতে যোজনা করেছিলেন। বর্তমানে চরকসংহিতা নামে প্রচলিত গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে চরক ও দৃঢ়বল উভয়েরই রচনা। তবে কোন্ অংশটি যে চরকের লেখা এবং কোন্‌টি দৃঢ়বলের সে সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। যে চরকসংহিতাখানি দেশ-বিদেশ থেকে এত সম্মান সংগ্রহ করেছিল সেটিও ছিল আচার্য দৃঢ়বলের দ্বারা সংস্কার করা চরকসংহিতা। অনেকে মনে করেন, দৃঢ়বল কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর একদল পণ্ডিতের মতে তাঁর জন্মস্থান পাঞ্জাব। তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। আবার চরকসংহিতার সংস্কার ছাড়া অপর কোন নতুন বইও রচনা করেননি। তাহলে হয়ত সেই যুগের রীতি অনুযায়ী নিজের পরিচয়টা পুস্তকমধ্যে প্রদান করতেন। এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, আচার্য দৃঢ়বল পতঞ্জলির বহু পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন চরক সংহিতার সংস্কারক হিসাবে।

আচার্য বাগ্‌ভট

আচার্য দৃঢ়বলের পর কেটে গেল আবার কয়েকশ বছর। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হল চরকসংহিতা এবং সুশ্রুতসংহিতার অনুরূপ আরও বহু সংহিতা। চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতার অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল বলে কিছু কিছু অজ্ঞাত নামা লেখক নিজেদের বইকে চরক-সংহিতা বা সুশ্রুতসংহিতা নাম দিয়ে চালাতে লাগলেন। ফলে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল যখন আসল চরকসংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা চেনার উপায় রইল না। কেবলমাত্র তাই নয়, চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা এবং আরও কয়েকখানি জনপ্রিয় সংহিতা গ্রন্থ ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে এগিয়ে গেল। মধ্যযুগে সেই সব লুপ্তপ্রায় গ্রন্থকে পুনরুদ্ধার করতে বহু পণ্ডিত আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁদের মধ্যে

একজন ছিলেন আচার্য বাগ্‌ভট। সুদীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রগুলি উদ্ধার করে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশগুলি এবং নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে এক মহান আয়ুর্বেদগ্রন্থ প্রকাশ করলেন। নাম দিলেন অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদ-সংগ্রহ। পুস্তকখানি মূলতঃ চিকিৎসা সংগ্রহ সার। আজও পুস্তক-খানির সমাদর সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ থেকে লেখক সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্য জানা যায়। লেখক নিজেকে বলেছেন বাগ্‌ভট, জন্মস্থান সিন্ধুদেশ এবং পিতার নাম সিংহগুপ্ত।

বাগ্‌ভট সম্বন্ধে অপরাপর যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় তিনি যৌবনে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু অবলোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র চর্চায় মনোনিবেশ করেন। মনে হয় তিনি পূর্বে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পরও উক্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা অব্যাহত রেখেছিলেন।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ঈৎসিং-এর বিবরণীতে একজন বাগ্‌ভটের উল্লেখ আছে। এই বাগ্‌ভট নালন্দার একজন আচার্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে ছিলেন অভিজ্ঞ। ইনি ঈৎসিং-এর গুরুও ছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, ঈৎসিং-এর গুরু বাগ্‌ভট এবং অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদ-সংগ্রহের রচয়িতা বাগ্‌ভট একই ব্যক্তি। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে বাগ্‌ভট খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলে মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। কারণ ঈৎসিং-এর বিবরণ থেকে জানা যায়, তিনি ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। তাম্রলিপ্ত বন্দরে অবতরণ করার পর পদব্রজে রাজগৃহ, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, কুশীনগর, সারনাথ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। সেই সময় নালন্দার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঈৎসিং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। একদিন ছাত্ররূপে উপস্থিত হয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, "তরুণ

আচার্য বাগ্‌ভটের" পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তরুণ আচার্য আবার চিকিৎসাশাস্ত্রেও ছিলেন সুপণ্ডিত। বাগ্‌ভটের চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে অনুপ্রেরণা দেয় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ঈৎসিং ২২ বছর কাল ভারতে ছিলেন, তারপর সেই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। এই বিবরণী থেকে অনুমান করা হয় বাগ্‌ভট দীর্ঘকাল নালন্দার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আচার্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়ঃকনিষ্ঠ। ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বয়স পঞ্চাশও অতিক্রম করেনি। ঈৎসিং বাগ্‌ভট-রচিত কোন পুস্তকের নামোল্লেখ করেননি। অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ তাই তাঁর শেষ বয়সের রচনা। কত খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকটি রচিত হয়েছে সেকথাও উল্লেখ করেননি বাগ্‌ভট।

অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ ছাড়াও অষ্টাঙ্গহৃদয় নামে আর একখানি গ্রন্থের রচয়িতা বাগ্‌ভট। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতে অষ্টাঙ্গহৃদয় অপর এক বাগ্‌ভটের লেখা। ভারতীয় গবেষকগণ একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা দেখেছেন দু-খানি পুস্তকেই ভাষাগত মিল যথেষ্ট আছে। উভয় পুস্তকের লেখক নিজেকে সিংহগুপ্তের পুত্র বলেও বর্ণনা করেছেন। তবে আর একজন বাগ্‌ভটের আবির্ভাব অবশ্য হয়েছিল। তাঁর রচনা "রসরত্নসমুচ্চয়" নামে একখানি পুস্তক। ইনি অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দু-জন বাগ্‌ভটের নাম পাওয়া যায় বলে, নালন্দার আচার্য এবং অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহের রচয়িতাকে "বৃদ্ধ বাগ্‌ভট" নামে অভিহিত করা হয়।

অষ্টাঙ্গআয়ুর্বেদসংগ্রহ পুস্তকটি সুবৃহৎ ও সুমহান। পুস্তকখানি ছ'ভাগে বিভক্ত। বিভাগগুলি যথাক্রমে সূত্রস্থান, শরীরস্থান, নিদান-স্থান, চিকিৎসাস্থান, কল্পস্থান ও উত্তরস্থান। গ্রন্থটিতে শল্যচিকিৎসার কথাও বর্ণিত হয়েছে। ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং গদ্য পদ্যময়। তাঁর পুস্তকখানি তত্ত্ব কিংবা কবিত্বের ভারে ভারাক্রান্ত নয়। বাগ্‌ভট যা বলতে চেয়েছেন তা সব জায়গায়ই স্পষ্ট। পুস্তকখানির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য শিক্ষার্থী এবং চিকিৎসক উভয়ের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে।

গ্রন্থখানির আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভূতবিদ্যা সংক্রান্ত আলোচনা। এত বিস্তৃত আলোচনা চরক, সুশ্রুত, কোথাও নেই। বাগ্‌ভট ভূতাবেশকে উন্মাদ রোগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাগ্‌ভট আয়ুর্বেদ সংগ্রহ এককালে সারা ভারতে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে।

মাধবকর

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সব বাঙ্গালী পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক রচনা করে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাধবকর অন্যতম। মাধব ছিলেন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা "রুগবিনিশ্চয়" এর এককালে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয়, আরব পারস্য প্রভৃতি দেশ-সমূহেও ছড়িয়ে পড়েছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদে খলিফা হারুণ অল্ রসিদের আগ্রহাতিশয্যে রুগবিনিশ্চয় বা মাধবনিদান পারস্য ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। চরক ও সুশ্রুতসংহিতার পর যে সব আয়ুর্বেদ পুস্তক বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল সেগুলির মধ্যে মাধবের রুগবিনিশ্চয়ই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মাধব তাঁর বইতে কিছু কিছু বাগ্‌ভটের বচন উদ্ধৃত করেছেন বলে সবাই মনে করেন মাধব বাগ্‌ভটের পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে তিনজন মাধবের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন শ্রীমাধব, আর একজন মাধবাচার্য এবং শেষজন মাধবকর। মাধবকর, শ্রীমাধব ও মাধবাচার্য থেকে পৃথক ব্যক্তি। শ্রীমাধব সুশ্রুতসংহিতার টীকাকার এবং তাঁর আবির্ভাবকাল মাধবকরের বহু পূর্বে। আর মাধবাচার্য অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি, আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী। অর্থাৎ মাধবাচার্য মাধবের অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্রীমাধব এবং মাধব দুজনেই আয়ুর্বেদশাস্ত্রকার কিন্তু মাধবাচার্য কোন আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচনা করেননি বলে অনেকের বিশ্বাস। মাধবাচার্য

আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ না হলেও প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুক্কের গুরু এবং প্রধানমন্ত্রী। ভারতপ্রসিদ্ধ বেদ ও উপনিষদের ভাষ্যকার মহাত্মা "সায়নের" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার নাম মায়ন এবং মাতা শ্রীমতী। শৈশবে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন এবং দীর্ঘকাল শৃঙ্গেরীর মঠে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি পরিচিত হন বিদ্যারণ্য স্বামী নামে। মাধবাচার্যের আর একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কবি ভোগনাথ। মাধবাচার্য নিজেও একাধিক বিষয়ে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্ব-দর্শনসংগ্রহ, জৈমিনীয়ন্যায়মালা, পঞ্চদশী, উপনিষদের টীকা এবং শঙ্করবিজয় প্রধান। মাধবাচার্যকে ভারতের মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে, সেই সঙ্গে তাঁর দুই ভ্রাতা সায়ন ও কবি ভোগনাথকে। মাধব বা মাধবকরের এমন বহুমুখী প্রতিভা ছিল না। তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন রুগ্‌বিনিশ্চয় বা মাধবনিদানের জন্য। আর একখানি গ্রন্থও মাধবের নামে প্রচলিত। সেটির নাম "রত্নমালা।" রত্নমালা গ্রন্থখানি কতকগুলি দ্রব্যগুণের পরিচয় মাত্র।

পণ্ডিত ভাবমিশ্র

ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের অনুশীলন দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত ছিল। এমনকি মোগলসম্রাট আকবরের আমলেও কিছু কিছু আয়ুর্বেদশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর এবং তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর উভয়েই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। আকবর নিজে নিরক্ষর হলেও তিনি বহুশাস্ত্রে ছিলেন অভিজ্ঞ। আবার জাহাঙ্গীর ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি —অবসর সময়ে পুস্তক রচনা করতেন। এই দুই মহান সম্রাটের শিক্ষাবিস্তারে দান যথেষ্ট। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র, ভারতীয় গণিত এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্র এঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু বিদেশী ভাষায়

অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু এই সময় ভারতীয় মনীষার অভাব লক্ষ্য করা যায়। যদিও আকবরের অকৃত্রিম বন্ধু আবুল ফজল, আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজী, স্বয়ং জাহাঙ্গীর, বাবর কন্যা গুলবদন এবং পরবর্তীকালে শাহজাহান পুত্র দারাশিকো ও সম্রাটদুহিতা জাহানারা, আওরঙ্গজেবের দুহিতা জেবউন্নিসা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে কিছুটা প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় এঁদের রচনা কেবলমাত্র সাহিত্য ও ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ। প্রাচীন ঐতিহ্য-সম্পন্ন আয়ুর্বেদশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রকে নিয়ে আদৌ গবেষণা হয়নি বলা যেতে পারে।

সম্রাট আকবরের সময় মাত্র একজন আয়ুর্বেদ সংগ্রহকারের নাম পাওয়া যায়। তিনি পণ্ডিত ভাবমিশ্র। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে কান্যকুব্জ দেশের কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতামাতার নাম জানা যায় না। তাঁর রচিত একখানি সংগ্রহ-পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতে প্রচলিত আয়ুর্বেদশাস্ত্র তাঁর হাতে পুনরায় নবকলেবর প্রাপ্ত হয়।

ভাবমিশ্র আবির্ভাবের কিছু পূর্বে ভারতে বৈদেশিক বণিকদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তাদের দ্বারা বিস্তারলাভ করেছিল কিছু কিছু বিদেশী রোগ। প্রাচীন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিদেশী রোগের বিবরণ ছিল না। পণ্ডিত ভাবমিশ্রই সেই সব বিদেশী রোগের কথা তুলে ধরেছিলেন সর্বসমক্ষে এবং প্রতিবিধানের উপায়েরও নির্দেশ দিয়েছিলেন। ভাবমিশ্র বিদেশ থেকে আগত রোগগুলিকে "ফিরিঙ্গী রোগ" নামে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত পুস্তকে কিছু কিছু "যাবনিকা" দ্রব্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। কিছু কিছু এমন ভেষজের উল্লেখ করেছেন যেগুলি ভারতের মাটিতে জন্মায় না।

পণ্ডিত ভাবমিশ্র সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকটি তাঁর শেষ বয়সের রচনা। তিনি কোন মোগল সম্রাটের অনুগৃহীত ছিলেন বলে মনে হয় না।

ভাবমিশ্রের পর আর ভারতে আয়ুর্বেদের অনুশীলন হয় নি। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অনেকটা দায়ী। প্রায় তুশ বছর ধরে এই অন্ধকার যুগের স্থায়িত্ব। এই সময়ের মধ্যে বহু প্রাচীন শাস্ত্রও লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা দেখেছি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতের শেষ কর্ণধার ছিলেন ভাস্করাচার্য। আর পণ্ডিত ভাবমিশ্র প্রাচীন আয়ুর্বেদ জগতের শেষ মনীষী। তৈলবিহীন প্রদীপের মত আয়ুর্বেদশাস্ত্র অতি ম্লান শিখায় কিছুকাল যাবৎ অল্প অল্প আলো বিতরণ করে আসছিল। হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল ভাবমিশ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। সুদীর্ঘ আড়াইশ—তিনশ বছরের পর আবার আয়ুর্বেদের অনুশীলন শুরু হয়েছে ভারতবর্ষে। এবার আর হঠাৎ নির্বাপিত হবে না।

জ্যোতিষী লল্লাচার্য

জ্যোতিষী লল্লাচার্য বরাহমিহিরের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হন। আনুমানিক ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে বা তার কিছুকাল আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লল্লাচার্য নিজেকে আর্যভট্টের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন। যদি তাঁর কথা সত্য হয়, তাহলে আর্যভট্ট একশ বছরের অধিককাল জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম শিষ্যধীবৃদ্ধ। আর্যভটীয় গ্রন্থকে ভিত্তি করে লল্লাচার্য এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। সেই হিসাবে লল্লাচার্য আর্যভট্টকে গুরু বলে স্বীকার করতেও পারেন। গ্রহের গতিবিধির ব্যাপারে তিনি কিছু কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়ে গেছেন, কিন্তু আর্যভট্টকে গুরু বলে স্বীকার করলেও গুরুদেবের ভূ-ভ্রমণবাদ স্বীকার করেননি। পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে অবিশ্বাসী হয়ে তাঁর পুস্তকে প্রশ্ন করেছেন, "যদি পৃথিবী দ্রুতগতিতে আবর্তন করেছে তাহলে মেঘগুলো কেন কেবল পশ্চিমদিকে যায় না? কোন বস্তুকে সজোরে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করলে সেটি পশ্চিমদিকে কেন পড়ে না?"

মুঞ্জাল

ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তের পর প্রায় তিনশ বছর ধরে জ্যোতির্বিদ্যার কোন ভাল পুস্তক রচিত হয় নি। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন আর একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। নাম তাঁর মুঞ্জাল। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকখানির নাম লঘুমানস। পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, পরবর্তী-কালে বিশ্ববরেণ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য উক্ত পুস্তক অবলম্বনে রচনা করেছিলেন সিদ্ধান্তশিরোমণি। ভাস্করাচার্য স্বীকারও করেছেন মুঞ্জালের ঋণ। মুঞ্জালের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তিনি গাণিতিক পদ্ধতিতে অয়নাংশ নির্ণয় করেছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্ অপেক্ষা গণিতজ্ঞ হিসাবে পরিচিত।

পৃথূদক

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে পৃথূদকের জন্ম হয়। তাঁর রচিত পুস্তকটির নাম সিদ্ধান্তশেখর। পুস্তকটি থেকে জানা যায় ৯৬২ শকাব্দে বা ইংরেজী ১০৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকখানি রচিত হয়েছিল। পৃথূদকই একমাত্র ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ যিনি সেই সময়ে আর্যভট্টের ভূ-ভ্রমণবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিই দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন—পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার করে আবর্তন করে। সিদ্ধান্তশেখর গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন নক্ষত্রমণ্ডল স্থির আছে। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে গ্রহনক্ষত্রদের উদয় অস্ত হয়। তিনি অত্যন্ত স্পর্ধার সঙ্গে ব্রহ্মগুপ্তের বিরোধিতা করেছিলেন।

শ্রীপতি

একাদশ শতাব্দীতে আরও কতকগুলি জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক রচিত হয়েছিল। কিন্তু সব পুস্তকের পরিচয় বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। দু-একখানি পুস্তকের পরিচয় ইতস্ততঃ ছড়ান আছে মাত্র। শতানন্দ ও ভোজরাজের সমসাময়িক আর একজনমাত্র প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নাম শ্রীপতি। শ্রীপতি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

অনেকের অনুমান শ্রীপতি উত্তর ভারতের লোক এবং একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। "ধীকোটি" এবং "সিদ্ধান্তশেখর" নামে দুখানি গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের বই তিনি রচনা করেছিলেন। পুস্তক-গুলির খ্যাতি এককালে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। শ্রীপতি কেবলমাত্র জ্যোর্তিবিজ্ঞানী ছিলেন না, অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ধীকোটি ও সিদ্ধান্তশেখর উভয় গ্রন্থই তাঁর উন্নত গণিত-জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে।

পরমাররাজ ধারেশ্বর ভোজ

ইনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মালবরাজ ভোজ বা সংক্ষেপে ভোজরাজা। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন বীর, অপরদিকে বিদ্যোৎসাহী ও মহা-পণ্ডিত। ১০১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভোজরাজ মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মালবের ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন। পূর্বে বলা হয়েছে প্রাচীন মালব পরে অবন্তি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কিন্তু হিউয়েন সাঙ, বাণভট্ট প্রভৃতি অবন্তি এবং মালব উভয়কে পৃথক দেশ বলে বর্ণনা

করেছে। মালব দীর্ঘদিন ধরে তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। এই রাজবংশে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভোজ তাঁর রাজধানী ছিল ধারা নগরী। সেই কারণে রাজা ভোজ ধারারাজ ভোজ বা ধারেশ্বর ভোজ নামে অধিক পরিচিত।

ধারেশ্বর ভোজ ছিলেন সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তাঁর নামে প্রচলিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় একশ-এর কাছাকাছি। অলঙ্কারশাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর একাধিক পুস্তক এখনও বর্তমান। মনে হয়, এত অধিক সংখ্যক পুস্তক তাঁর দ্বারা রচিত হয়নি। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত পুস্তকাবলী তাঁর নামে পরিচিত হয়েছিল। তবে তিনি যে আদৌ পুস্তক রচনা করেননি এমন নয়। বেশ কয়েকটি মূল্যবান্ গ্রন্থ আজও তাঁর বিরাট প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

ভোজরাজের অমূল্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সরস্বতীকণ্ঠাবরণ' নামে একখানি অলঙ্কারশাস্ত্রের বই এবং ঐ নামের একখানি ব্যাকরণের পুস্তক, 'যুক্তিকল্পতরু' নামে নীতিশাস্ত্রের পুস্তক, 'তত্ত্বপ্রকাশিকা' নামে ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের পুস্তক, 'রাজমার্তণ্ড' নামে আয়ুর্বেদের পুস্তক এবং 'রাজমৃগাঙ্ক' নামে জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তক প্রধান। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ধারেশ্বর ভোজ ছিলেন বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বৈয়াকরণিক, কবি, বীর, রাজনীতিবিদ্ ও বিদ্যোৎসাহী। এককালে সারা উত্তর ভারতে তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তক 'রাজমৃগাঙ্ক' সুবিদিত ছিল। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকার মত না হলেও বইটি বিশেষ কতকগুলি কারণে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে।

চেতনা-নাশক দ্রব্যের ব্যবহার ও প্রাচীন ভারতবর্ষ

আজকাল রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হলে প্রথমে চেতনা-নাশক দ্রব্যের প্রভাবে রোগীকে সংজ্ঞাহীন করে দেওয়া হয়; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রোগীকে অজ্ঞান করবার কোন পদ্ধতি জানা ছিল না। তখন রোগীকে যে পদ্ধতিতে অস্ত্রোপচার করা হত তা একদিকে যেমন ছিল নিষ্ঠুর অপর দিকে তেমনই ছিল ভয়াবহ। কয়েকজন বলশালী ব্যক্তি রোগীকে জোর করে বেঁধে ফেলত এবং তারই চোখের সামনে ধারালো সব অস্ত্র দিয়ে জহ্লাদের মত চিকিৎসকরা ক্ষিপ্রগতিতে কাটা-ছেঁড়া করতেন। এই অবস্থায় রোগীকে কিছুতেই সুস্থির রাখা যেত না। অনেক সময় রোগীরা ভয়ে মূর্ছা যেত, জীবনে সে মূর্ছা আর ভাঙত না। তাই যাঁরা শল্য-চিকিৎসায় পারদর্শী হতেন তাঁদের হ'তে হত কসাইয়ের চেয়ে নিষ্ঠুর এবং হৃদয়হীন।

প্রাচীন ভারতে শল্যচিকিৎসার সংজ্ঞা ছিল, কঠোর পরিশ্রমের পরও যাঁদের দেহ থেকে একবিন্দু ঘাম বেরোয় না, যাঁদের অস্ত্র একটা চুলকেও লম্বালম্বিভাবে কেটে দুভাগ করতে পারে, তাঁরাই যথার্থ শল্য-চিকিৎসক। এই থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, শল্য-চিকিৎসককে কি পরিমানে মনোবল ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে হত। কিন্তু এমন অনেক শল্যচিকিৎসক ছিলেন যাঁরা এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কোন কোন চিকিৎসক রোগীকে অজ্ঞান করিয়ে অস্ত্রোপচারের কথা চিন্তা করতে থাকেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় ডাক্তার মর্টনের। যিনি চেতনা-নাশক দ্রব্য হিসাবে প্রথম ইথার ব্যবহার করেছিলেন।

সেই সময় প্রসূতিসদনের এক তরুণ ডাক্তার প্রসূতিদের প্রসব যন্ত্রণা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম ডাক্তার সিম্পসন্। সামান্য এক রুটিওলার পুত্র। জন্ম ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন, লিন্‌লিথ্‌গোর বাথগেট নামক এক অখ্যাত পল্লীতে। পিতার নাম ডেভিড সিম্পসন্। দরিদ্রের সন্তান হয়েও নিজ অধ্যবসায়ের গুণে মাত্র একুশ বছর বয়সে ডাক্তারী পাশ করেছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রতিভা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোলজির অধ্যাপক ডাঃ টম্‌সন্ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে নিজ সহকারীরূপে গ্রহণ করেন। দুবছর পরে ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকের পদ খালি হলে ডাঃ সিম্পসন্ ঐ পদের জন্য প্রার্থী হন। কর্তৃপক্ষ জানতেন সিম্পসনের মত যোগ্য প্রার্থী খুব কমই আছে; তথাপি অতিরিক্ত দুটি যোগ্যতার অভাবে তাঁকে নিয়োগ করা হল না। সে দুটি যোগ্যতা হল, তিনি উচ্চবংশসম্ভূত নন এবং অবিবাহিত। কিন্তু নিরাশ হলেন না সিম্পসন। শরণাপন্ন হলেন 'জেসি গ্রিণ্ডলে' নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর কন্যার। সিম্পসনের অদ্ভুত প্রস্তাবে জেসি প্রথমে অবাক হয়ে গেলেও তাঁকে প্রত্যাখান করতে কেমন যেন মায়া হল তাঁর। শেষে সিম্পসনকে বিয়ে করতে রাজী হওয়ায় সিম্পসন্ অতিরিক্ত দুটি যোগ্যতা অর্জন করলেন এবং ধাত্রীবিদ্যায় অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হলেন।

এইখানেই মাতৃজাতির অবর্ণনীয় কষ্টের কথা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। যে মায়ের কৃপায় পৃথিবীর আলো-বাতাস ভোগ করার অধিকার তিনি পেয়েছেন সেই মাতৃজাতির কষ্ট তাঁকে লাঘব করতেই হবে। তিনি প্রায়ই দেখতেন অস্ত্রোপচারের সময় বহু মা ভয়ে মূর্ছা যান। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে মূর্ছা আর ভাঙ্গে না। ভাবেন ডাক্তার, যদি কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের অজ্ঞান করিয়ে দেওয়া যেত তাহলে এমন বিপত্তি ঘটত না। তখন ইথার, নাইট্রিক অক্সাইড প্রভৃতি দু' একটি চেতনা-নাশক দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে মাত্র, কিন্তু এগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে ডাক্তারদের মধ্যে ছিল যথেষ্ট সন্দেহ।

সিম্পসন্ একদিন ইথারের সন্ধান পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে প্রয়োগ করে বসলেন এক প্রসূতির উপর। তিনি সুফল পেলেও জনসাধারণ তাঁর এ কাজকে সমর্থন করলেন না। তাঁরা চারদিকে আন্দোলন গড়ে তুললেন। তাতে আবার যোগ দিলেন যাজক সম্প্রদায়। বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁরা জনসাধারণকে বোঝাতে লাগলেন প্রসূতিকে অজ্ঞান করে প্রসব-বেদনা দূরীকরণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের কর্তব্য হচ্ছে দুঃখ ও কষ্টের ভেতর দিয়ে সন্তানের জন্ম দান করা ও তাদের লালন পালন করা।

ব্যথিত হলেন ডাক্তার। মানুষের ব্যথা লাঘব করতে গেলেও যে আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তিনি নিজে ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী। তাই বাইবেল নিয়ে আগাগোড়া বারবার পড়তে লাগলেন। কারণ ধর্মবিরোধী হওয়া তাঁর একেবারেই ইচ্ছা নয়। কিন্তু বাইবেলে যাজক প্রচারিত কোন নির্দেশ তিনি খুঁজে পেলেন না। পরন্তু ইভের জন্মকথা পড়তে পড়তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। বাইবেলে আছে আদমের বুকের পাঁজর থেকে যখন ইভের জন্ম হল তখন স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। ভাবলেন ডাক্তার, এই গভীর ঘুমের তাৎপর্য কি যা বুকের পাঁজর কেটে নেওয়ার সময়ও ভাঙ্গে না? নিশ্চয়ই ঈশ্বর আদমকে অচৈতন্য করে রেখেছিলেন।

বুকে জোর পেলেন সিম্পসন্। ইভের জন্মের কথা উল্লেখ করে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জোরালোভাবে প্রচার করলেন, কঠোর যন্ত্রণা থেকে মানুষকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া ধর্মবিরুদ্ধ নয় বরং ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা। প্রতিপক্ষ অন্য দশটা যুক্তি প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন তাঁকে ঘায়েল করতে। যদিও সে যুক্তিগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ডাক্তার এতটুকুও দমলেন না; পরন্তু অজ্ঞান হতে আগ্রহী মায়েদের উপর ইথার প্রয়োগ করতে লাগলেন। কিন্তু ইথার ব্যবহার করে কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে লাগলেন।

তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে খুঁজতে হল অপর কোন সুষ্ঠু চেনতা-নাশক দ্রব্য। দীর্ঘদিন খোঁজাখুঁজির পর একদিন দৈবক্রমে আবিষ্কার করলেন ক্লোরোফর্ম-এর চেতনা-নাশক ক্ষমতা। ততদিনেও প্রসূতিদের উপর চেতনা-নাশক দ্রব্য প্রয়োগের বাধা অপসারিত হয় নি। তাই এই নতুন দ্রব্যটি প্রথমে প্রয়োগ করলেন নিজের এক ভাইঝির উপর। মুগ্ধ হলেন ডাক্তার ক্লোরোফর্ম-এর চেতনা-নাশক ক্ষমতা দেখে।

তখনকার দিনে ইংলণ্ডের মত দেশেও অনেক ক্ষেত্রে সমাজে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল না। মেয়েরা ক্লোরোফর্ম গ্রহণে আগ্রহী হলেও জনসাধারণের চাপে তাঁরা নিতে পারতেন না। সংস্কার-মুক্ত যাঁরা, তাঁরা কেউ কেউ প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করলেও অনেকে গোপনে গ্রহণ করতেন। শেষে সমস্ত বাধা এবং বাদানুবাদের অবসান ঘটালেন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। তিনি তাঁর সপ্তম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে ভয়ানক কষ্টের সম্মুখীন হলেন। তাই বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেন ক্লোরোফর্ম। খুশী হলেন ডাক্তার সিম্পসন্, মঙ্গল হলো সমস্ত মাতৃ-জাতির। শোনা যায়, মহারাণী ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করে বাধা অপসারণ করার দু বছরের মধ্যে একমাত্র এডিনবরাতেই চল্লিশ হাজার প্রসূতি ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

দীর্ঘদিন অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লড়াই করে ডাক্তার সিম্পসন্ অদ্ভুত মনোবলের পরিচয় দিয়ে গেছেন। এঁরাই যথার্থ মায়ের সন্তান, এঁরাই যথার্থ বীরপুরুষ। একটি মানুষকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে, তথাপি জয় হয়েছে তাঁদেরই। সব দেশেই এমন মানুষ জন্ম নিয়েছেন যদিও সংখ্যায় অতি নগণ্য। এঁদের জন্মদান করে জন্মভূমি হয়েছে পবিত্র, পৃথিবী হয়েছে ধন্য।

সিম্পসনের আবিষ্কার ক্লোরোফর্ম কেবলমাত্র প্রসূতিদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রইল না, ধীরে ধীরে সব রকম অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ক্লোরোফর্মের ডাক পড়লো। আজকে বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিনে ক্লোরোফর্মের ব্যবহার সীমিত হয়ে এসেছে ; তথাপি রোগীকে অচৈতন্য করার পদ্ধতিকে আজও বলা হয় 'ক্লোরোফর্ম করা'। বিজ্ঞান এগিয়ে

চলেছে দ্রুতগতিতে, সংজ্ঞাহীন করে অস্ত্রোপচারের আবিষ্কারক হিসাবে ডাঃ সিম্পসনের নাম বিশ্ববাসী চিরকাল স্মরণ করবে।

চেতনাহীন করা আধুনিক পদ্ধতি হলেও, অতি প্রাচীনকালে ভারতে এ রীতি প্রচলিত ছিল। যদিও পরের দিকে এ পদ্ধতি অনুসৃত হয় নি। প্রসূতিদের চেতনা লুপ্ত করার জন্য এককালে ভারতে এক ধরণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তার নাম সম্মোহনবিদ্যা। অপরাপর অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে কতকগুলো গুঁড়ো পদার্থ ব্যবহার করা হতো। এই গুঁড়ো পদার্থ আগুনে ফেলে সৃষ্টি করা হত ধোঁয়া। আর সেই ধোঁয়াকে ধরা হত রোগীর নাকের কাছে।

ভারতীয় শল্যচিকিৎসা অতি প্রাচীন। দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সুশ্রুত, জীবক প্রভৃতি বিখ্যাত চিকিৎসকগণ সবাই ছিলেন শ্রেষ্ঠ শল্যচিকিৎসক। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই বিভাগের গবেষণাও হয়েছিল যথেষ্ট। এখনকার মত সে যুগেও বহু চিকিৎসককে ভাবিয়ে তুলেছিল এই নিষ্ঠুরতা। তারই পরোক্ষ ফল 'সম্মোহনবিদ্যা'। শল্যচিকিৎসককে এই বিদ্যাটি আয়ত্ত করতে হত। এই বিদ্যাটি যে কি ছিল, কেই বা আবিষ্কার করেছিলেন আজ বলা শক্ত। কেউ বলবেন যাদুমন্ত্র, কেউ বা ম্যাস্‌মারিজম্‌ জাতীয় এক অদ্ভুত ক্ষমতা, কেউ বা বলবেন কোন রাসায়নিক কিংবা উদ্ভিজ পদার্থ যা মানুষের নাকের কাছে ধরলে শরীর আপনা হতেই বিবশ হয়ে যায়। সম্মোহন-বিদ্যা এখনও কেউ কেউ প্রয়োগ করে মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য অচৈতন্য করে রাখতে পারেন বলে শোনা যায়, তবে সঠিক কিছু বলা যায় না।

দ্বিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার ভারতে এসে মুগ্ধ হয়েছিলেন এখানকার শল্যচিকিৎসার পদ্ধতি দেখে। তাই তো নিজ সৈন্যদলে নিযুক্ত করেছিলেন বহু ভারতীয় শল্যচিকিৎসক; যাঁদের মধ্যে অনেকেই সংজ্ঞাহীন করে অস্ত্রোপচার করতে পারতেন।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান—ধারা ও ধরন

'চোখ রাঙালে না হয় গ্যালিলিও
লিখে দিলেন, পৃথিবী ঘুরছে না
পৃথিবী তবু ঘুরছে, ঘুরবেও
যতই তাকে চোখ রাঙাও না!'

আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ন—প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার এই চারটি মূল শাখা ছাড়াও পঞ্চম আর একটি প্রশাখা ছিল, যাকে বলা যাবে জীবনবিধি। কিম্বা বলা যায় সুস্থ জীবনচর্চার ওই মূল স্রোত থেকেই বেরিয়ে এসেছিলো পূর্বোক্ত চার প্রধান শাখা। সুস্থ জীবনচর্চার যে নিয়মসূত্র 'মনুসংহিতা'য় আনুপাঙ্ক্তিক বর্ণনা পেয়েছে।

তবু জীবনধর্মের চেয়ে জীবনে ধর্মকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে ওই মূল স্রোত কী করে একদিন গতি হারালো, কেন, ভেবে দেখা দরকার। অথর্ব ও ঋগ্‌বেদে স্বাস্থ্যবিধির যে ছাড়া ছাড়া ও প্রাথমিক উল্লেখ ছিল পঞ্চম বেদ নাম দিয়ে তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আয়ুর্বেদের জন্ম। বিদ্যাটি দাঁড়িয়ে ছিল, বায়ু পিত্ত শ্লেষ্মা—এই ত্রিদোষ তত্ত্বের উপর। পঞ্চম বেদের 'পঞ্চমত্ব'র সঙ্গে সংযোগ রেখেই হয়তো, বলা হত পঞ্চবায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান; পঞ্চপিত্ত—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক, ভ্রাজক, আর পঞ্চ শ্লেষ্মা—ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন, শ্লেষণ—এর কথা। বিদ্যাটি অগ্রগামী ছিল মননে ও সাফল্যে, স্বীকৃতি পেয়েছিল এমনকি বহু পরবর্তী কালের মানুষের ও বিশেষজ্ঞেরও, স্বদেশে ও বিদেশেও। তবু ধর্ম ক্রমাগত তার অপচ্ছায়া ছড়িয়ে দিতে দিতে আয়ুর সঙ্গে আত্মা আর চিকিৎসাবিদ্যার সাথে যাদুবিদ্যাকে জুড়ে দিয়ে আয়ুর্বেদকে রোদে জলে আর হাওয়ায় যতটা সে পারতো ততটা বেড়ে উঠতে দেয় নি। আর তাই আদি সাফল্যের পর ক্রমেই আয়ুর্বেদকে সংকুচিত হতে হয়েছে কৃতিত্বে। শুধুই হয়ে থাকতে হয়েছে অতীতের মুখাপেক্ষী, পক্ষপাতী হতে হয়েছে রোগ নিরাকরণের বদলে রোগ নিবারণের, খাদ্যগুণের—প্রোটিন, শ্বেতসার, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ, লবণ, ভিটামিন—বিশ্লেষণের বদলে করতে

হয়েছে খাদক প্রকৃতির বিশ্লেষণ। বিজ্ঞানকে আধা ধর্ম আর আধা বিজ্ঞানে, ইতিহাসকে আধা পুরাণ আর আধা ইতিহাসে ভাগ করে দিতে গিয়ে যে বিপর্যয় ঘটেছে তা স্পষ্টতর হয়েছে জ্যোতিষে। এমনই করে তোলা গেছে দেশের অবস্থা যে বরাহমিহিরের মত জ্যোতির্বিজ্ঞানীকেও বলতে হয়, গণিত-জ্যোতিষ আসলে নারদ মুনি কর্তৃক দেব বৃহস্পতিকে কথিত ও পরে গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ দ্বারা অধীত ও প্রচারিত বিদ্যা। এই অবস্থায় আর্যভট্টের পৃথিবীর আকার, পৃথিবীর গতি আর গ্রহণের কারণ বিষয়ে শাস্ত্রবিরোধী উক্তি যে বরাহমিহির বা ব্রহ্ম-গুপ্তের বিরোধিতা পাবে এই তো স্বাভাবিক, আর্যভট্ট আর চার্বাক যে একান্ত কালাপাহাড়! সূত্র, উদাহরণ, স্থাপন, করণ, প্রত্যয়ে বিভক্ত পর্যবেক্ষণ, যুক্তি ও বিশ্লেষণ ভিত্তিক দ্বান্দ্বিক প্রণালীর প্রচার ও প্রসারের ফলে জ্যোতিষ এই শাস্ত্রে ধর্মের প্রভাব থেকে এই শাস্ত্রে দর্শনের প্রভাবে উত্তরণ পাবে এই আশাও অচিরেই ব্যর্থ হয় কেননা অপার আকাশের অন্ধকার রহস্যে যে গোপনতা আছে তার উদ্ঘাটনের চেয়ে তার মিষ্টিসিজম্ই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বেশি করে টেনেছিল। যার ফল অনুমেয়, রাসেল সুন্দর বলেছিলেন, কেউ কেউ তো পরমাণু গণিতের নিয়মকে মানে না, এই সত্যে ধর্মকে খুঁজে পান আর কেউ কেউ খুঁজে পান পরমাণু গণিতের নিয়মকে মানে, এই সত্যে।

জ্যোতিষের তুলনায় রসায়ন নিশ্চয়ই অনেক বাস্তব। রসায়নের প্রণালীকে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আপ্তবাক্যের চার ধাপে গেঁথে নিয়ে, খনিজ দ্রব্য সম্ভারকে রস, উপরস, রত্ন, লোহা—চার ভাগে ভাগ করে, নানান যন্ত্রের—ঢোল যন্ত্রম, পাতন যন্ত্রম, অধস্পাতন যন্ত্রম, ঢেকি যন্ত্রম, বালুকা যন্ত্রম, লবণ যন্ত্রম, ধূপ যন্ত্রম—সহযোগিতায় যে বিদ্যার অধ্যয়ন হত তা যথেষ্ট অগ্রসর ছিল, কিন্তু আয়ুর্বেদের সঙ্গে যেমন আত্মা আর জ্যোতিষের সঙ্গে স্বর্গীয় মরমিয়াবাদকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রসারের জন্য রসায়নকেও তেমনি নিজেকে জড়িয়ে নিতে হয়েছিল তন্ত্রের সঙ্গে যার শোভন নাম ছিল রসশাস্ত্র। পুনর্জীবন, যৌবনধারণ, পরশপাথর, যোগ রসায়ন—বিশুদ্ধ রসায়নের ওপর ছড়িয়ে পড়ত যাদু রসায়নের এই সব আবর্জনা ও গাদ। যোগ্য চর্চার জন্য রসায়নকে তাই ফিরে ফিরে যেতে হত চিকিৎসাবিদ্যার আওতায়। তাই প্রায়োগিক ও কারিগরী দিকটির বাইরে রসায়ন থেকে গেল মূলত অশুদ্ধ ও আদিম। সেই আদিমতায় কণাদ, কপিলের উদ্ধত উচ্চারণ গেল হারিয়ে।

কল্পসূত্র, শূল্যসূত্রের আমল থেকেই অঙ্ক আর জ্যামিতিকে পুজোর বেদীর আঁকজোক আর যাগ যজ্ঞ ও বলির বেদীর মাপজোখে লাগানো হত। বৌধায়ন

আকার আয়তন রূপান্তর ও জ্যামিতি নিয়ে বিশুদ্ধ চর্চা করেছিলেন, মেধাতিথি আবিস্কার করেছিলেন এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা, দশ ও দশের গুণিতকের জন্য বিভিন্ন মুদ্রা, এমনকি ভগ্নাংশও (যার সমস্ত প্রশংসাটাই অন্যায্যভাবে পায় আরবীয়রা), আরও ছিলেন আর্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য। উন্নত, সম্পন্ন ছিল ভারতে গণিত যার কথা বলতে গিয়ে সাত শতকের সীরীয় জ্যোতিষী সেবখত লিখেছেন, হিন্দুদের জ্ঞানের, বিশেষত জ্যোতির্বিজ্ঞানে সূক্ষ্ম আবিস্কারের যা গ্রীক ও ব্যাবিলনবাসীদের চাইতেও উন্নত, এবং গণিত পদ্ধতির যা ভাষায় প্রশংসার অতীত, বিষয়ে বিস্তারিত বলা প্রয়োজন। এই রচনার চারশো বছর বাদে, আল বেরুনি সমসাময়িক ভারতীয়দের বিষয়ে লিখতে গিয়ে বলেছেন, হিন্দুদের বিশ্বাস তাদের দেশের মত কোন দেশ নেই, তাদের বিজ্ঞানের মত নয় কোন বিজ্ঞান। এরা নিস্ফল, আত্মাভিমানী, নির্বোধ। অন্য জাতির সঙ্গে মেশার সুযোগ পেলে এরা বুঝতে পেত এদের ধারণা কত ভুল।

অনেকটা ছড়িয়ে থাকা তুলো যেমন আসলে ওজনেও অনেকটা না, আত্মা, স্বর্গ আর তন্ত্রের জল ছিটিয়ে অনেকটা তুলোকেও তেমনি একটুখানি করে তুলতে ভারতীয় ধর্মের চেষ্টার বিরতি ছিল না। যা বিপজ্জনক তা আদৌ নয়, বরং নীরবতা, গোপনতা ও অন্ধকার—রহস্যময় বলে তাই, এই ছিল ধর্মের লক্ষ্য, ভারতীয় ধর্মের। এই কৃত্রিম ও আরোপিত উদ্দেশ্য ছিল বলেই, বিদেশী ধর্ম এসে বারবার ভারতবর্ষকে পরাধীন করে গেছে, করতে পেরেছে, প্রতিবার। ধর্মের সেখানে কিছুই করার ছিল না, কেননা কোন জীবনীশক্তিই ছিল না তার। যাদের করার ছিল—বিজ্ঞানী ও শিল্পীরা, তারাও প্রায়ই পারেন নি, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের এই হল ট্র্যাজেডি।

ধীমান দাশগুপ্ত